প্রবন্ধ : ত্রিপুরা

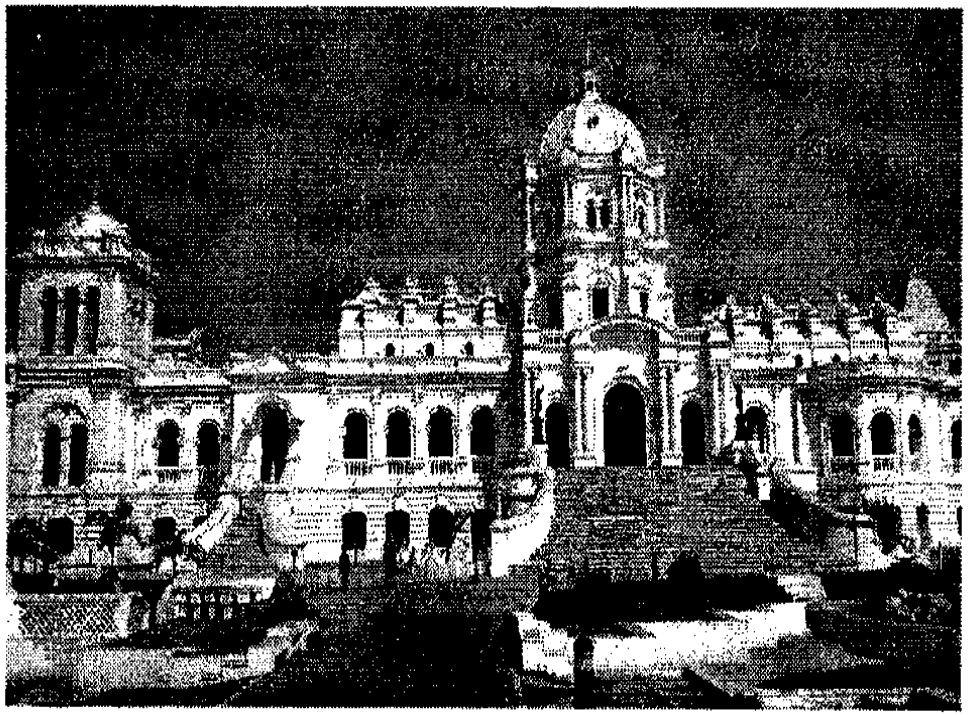

ত্রিপুরার বাংলা কবিতা : পরিব্রাজনের হাজার বছর

অশোকানন্দ রায়বর্ধন

ত্রিপুরা একটি প্রাচীন রাজ্য। এর নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রথমত, ত্রিপুরা রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর নামে এই রাজ্যের নাম 'ত্রিপুরা' হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। ত্রিপুরার উদয়পুরের মাতাবাড়ি ভারতের অন্যতম শক্তিপীঠ। পুরাণকাহিনিতে উল্লেখ আছে যে এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল। পীঠমালা গ্রন্থে উল্লেখ আছে —

'ত্রিপুরায়াং দক্ষিণপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী
ভৈরবস্ত্রিপুরোশশ্চ সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ।।'

অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হওয়ায় এখানে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হয়েছেন।

আর একটি মত বলছে, মহাভারতের যুগে মহারাজ দৈত্যের পুত্র ত্রিপুরা অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তখন এই রাজ্যের নাম ছিল 'কিরাত'। মহারাজ ত্রিপুর কিরাত নামের বিলোপসাধন করে এই অঞ্চলের নাম রাখেন 'ত্রিপুরা' এবং স্বজাতীয় লোকদের নাম রাখেন ত্রিপুরাজাতি। প্রাচীন রাজমালার লেখকগণ উল্লেখ করেন যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় সহদেব 'ত্রিপুরা' রাজ্য জয় করেছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে মহাদেবের দিগ্বিজয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে :

'মাদ্রী সুতস্ততঃ প্রায়াদ্বিজয়ী দক্ষিণাং দিশং।
ত্রৈপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমমিতৌজনম্॥'

কিন্তু এখানে 'দক্ষিণাং দিশং' শব্দটি নিয়ে এবং পরবর্তী অংশে সহদেব ত্রিপুররাজ ও গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করে সৌরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন বলে বর্ণিত হওয়া 'ত্রিপুরা'র অবস্থান নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। অনেকে বলছেন এটি মধ্যভারতের অন্তর্গত জব্বলপুরের নিকটবর্তী কোনও অঞ্চল হতে পারে।

এছাড়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৬২-১৮৯৬) মাণিক্যের সময়ে 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) "যে অনার্য কিরাতদিগকে আমরা 'তিপ্রা' (ত্রিপুরা) আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকি, তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে 'তুই' বলে। এই 'তুই' শব্দের সহিত 'প্রা' সংযুক্ত করিয়া 'তুইপ্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই তুইপ্রা হইতে তিপ্রা, এবং তিপ্রা হইতে ক্রমে তৃপুরা, ত্রীপুরা এবং ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।" কিরাত জনজাতির ভাষায় 'প্রা' শব্দের অর্থ নিকটে বা কাছে। অর্থাৎ একসময় ত্রিপুরা রাজ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁর আলোচনায় প্রাচীন কুকিপ্রদেশ, মিতাই (মণিপুর) রাজ্য, কাছাড়, শিলহট্ট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেও উল্লেখ করেন। প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থেও এই তথ্যের সত্যতা মেলে। মহারাজ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৪৩০ খ্রি.-১৪৬২ খ্রি.) তাঁর দুই সভাপণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রচিত রাজমালা গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে —

'কিরাত নগরে রাজা বিবিধ গঠন।
রাজ্যের সীমানা কহি শুনহ বচন॥
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী, দক্ষিণে রসাঙ্গ।
পূর্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচবঙ্গ॥
ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল এক পুরী।
নানামত নির্মাইল পুরীর চত্তারি॥'

এই বর্ণমালা থেকে জানা যায় যে, সমগ্র লুসাই প্রদেশ, মণিপুর রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের কিছু পার্বত্য অঞ্চল, মধ্য ও দক্ষিণ কাছাড়, শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, ঢাকার পূর্বাংশ, সমগ্র নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার সমগ্র অঞ্চল এককালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ব্রহ্মার প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ্য পাটিকারা নামে পরিচিত। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় 'পাটিকারা' নামে ছোটো একটি রাজ্যের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে এই রাজ্যের যোগাযোগ ছিল। 'পাটিকারা' রাজ্যের মুদ্রায় ষাঁড় ও ত্রিশূলের চিহ্ন লক্ষ করা গেছে। আরাকান রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে ত্রিপুরা রাজ্যকে বিভিন্ন নামে অবিহিত করা হয়েছে। আবার প্রাচীন মণিপুর রাজ্যে ত্রিপুরা রাজ্য 'একলেঙ' রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণ ত্রিপুরা রাজ্যকে 'জাজনগর' বা 'জাজিনগর' বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্ববঙ্গে 'চন্দ্রবংশ' নামে কোনও এক বংশের কয়েকজন রাজা ৮৭৫ খ্রি. থেকে ১০৩৫ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানী কুমিল্লার নিকট লালমাই পাহাড় অঞ্চলে ছিল বলে জানা

যায়। তাঁদের একটা পর্যায়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। চন্দ্ররাজাদের পতনের পর পূর্ববঙ্গে বর্মন রাজারা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তাঁদের রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে। এই বর্মন রাজাদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজবংশের কোনোপ্রকার সম্পর্ক ছিল কিনা জানা যায় না।

ত্রিপুরার বাংলা কাব্যের হাজার বছর

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আজও তেমন গবেষণা হয়নি। মোটামুটিভাবে এই রাজ্যের ইতিহাসের শুরুর প্রামাণ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম রত্নমাণিক্যের সময় থেকে। তার পূর্বের কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা, স্থাপত্যকীর্তি, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র ইতিহাসসূত্র থেকে জানা যায়, বাংলার সুলতান রুকুন্-উদ্-দীন বারবাক শা-র (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) কাছ থেকে রত্নফা প্রথম 'মাণিক্য' উপাধি পেয়েছিলেন। এর কাছাকাছি সময়ে বঙ্গের আর একজন সুলতান ছিলেন নাসিরুদ্দিন মাহমুদ্ শাহ (১৪৩৯-১৪৫৯ খ্রি.) কিন্তু তার আগেও যে এ অঞ্চলে জনবসতি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বক্সনগরের বৌদ্ধ সভ্যতা (৫ম থেকে ১২শ শতাব্দী), পিলাকের বৌদ্ধসভ্যতা (৯ম-১০ম শতাব্দী) এবং সন্নিহিত অঞ্চল ময়নামতী বা লালমাই-এর প্রাচীন সভ্যতা ইত্যাদি। তবে বহু প্রাচীনকাল থেকে যে এখানে অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোক এখানে ছিল তার উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায়। রাজমালা-র যুঝার খণ্ডে উল্লেখ আছে —

'রাঙ্গামাটি দেশেতে যে লিকা রাজা ছিল।
সহস্র দশেক সৈন্য তাহার আছিল।
ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধ করে পরিপাটি
ভঙ্গ দিয়া সব লিকা গেল রাঙ্গামাটি'

এই দুটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে, একসময় এই অঞ্চলে লিকা নামে একটা জাতিগোষ্ঠী বাস করত। আনুমানিক ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুর রাজা হিমতি ফা বা যুঝারফা রাঙ্গামাটি জয় করে দেশ বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ তাঁর পূর্বপুরুষের নামানুসারে ত্রিপুরাব্দ প্রচলন করেন। জানা যায় যে, এই 'লিকা' জাতি হল জনপদের আদিপুরুষ। তাহলে এটা বোঝা যায় যে, ত্রিপুরায় অতি প্রাচীনকালে মগজাতির লোকেরা বসবাস করতেন।

ত্রিপুরার ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায় যে, পিলাক বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন। 'পিলাক' এবং 'লিকা' শব্দ দুটির সঙ্গে মগভাষায় ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। মগদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও জানা যায় যে, তাঁরা আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। আরাকানের রাজা ধর্মবিজয় (৬৬৫-৭০১ খ্রি.) চট্টগ্রাম ও সমতট সহ বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চল দখল করেছিলেন। মগ জাতির মানুষের মধ্যে বিশ্বাস তাঁদের পূর্বপুরুষেরা পাকাপাকিভাবে ত্রিপুরায় এসেছিলেন ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে।

এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাচীনকাল থেকে চাকমা জাতি অবস্থান করার কথাও কোথাও উল্লেখ আছে। 'রাধামন-ধনপুদি' ও চাদিগাং ছারা পালা' এই পুরাকাহিনি দুটিতে চাকমা জাতির আদি উৎস সম্পর্কে জানা যায় যে, চাকমারা একসময় চম্পকনগরে বাস করত। আবার চাকমা সমাজের প্রচলিত একটি গানে জানা যায় যে, চাকমারা চম্পকনগর নয়, নুরনগরে বসবাস করত।

'ডোসে বাজায় ঢোল ডগর
ফেনি যেইয়ুম নুরনগর।'

এই নুরনগর ত্রিপুরায় অবস্থিত। ত্রিপুরায় গোমতী নদীর উৎস সম্বন্ধে যে আখ্যান

প্রচলিত আছে তা চাকমা সমাজ এখনও পবিত্র বলে মনে করে। পার্বত্য ত্রিপুরার সাথে চাকমাদের যোগসূত্র রয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। ধরে নেওয়া হয় প্রাচীন ত্রিপুরায় মগ ও চাকমা জাতি সমসাময়িককালে পাশাপাশি অবস্থান করতেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। রাজমালার আর একটি পদে লিকাদের সহযোগী হিসেবে জানা যায় —

'ধামাই জাতি পুরোহিত আছিল তাহার।
অভক্ষ্য না খায়ে তারা সুভক্ষ্য ব্যাভার॥
আকাশেত ধৌত বস্ত্র তারাহ শুকায়।
শুকাইলে সেই বস্ত্র আপনে নামায়॥
বৎসরে বৎসরে তারা নদী পূজা করে।'

— এখানে উল্লেখ্য যে চাকমাদের একটা 'গোঝা'র (গোষ্ঠীর) নাম 'ধামেই গোঝা'। লিকাদের সঙ্গে তারাও যে বসবাস করত, এখানে প্রকারান্তরে তা বোঝা যায়। আর চাকমাদের সংস্কৃতিতে নদীপূজার প্রচলনও রয়েছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা একবস্ত্র ব্যবহার করতেন এবং ধৌত করার পর তা রৌদ্রে শুকানোর জন্য মেলে দিতেন। এইসব তথ্য থেকেও অনুমান করা যায় যে সেকালে চাকমারাও এখানে বসবাস করত। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় তা এই দুই জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট। যেহেতু পরবর্তী সময়ে তারা ত্রিপুরার রাজের হাতে পরাজিত হয় সে কারণে বিজিত জাতির চিহ্নিত নিদর্শনের উপর থেকে পরবর্তী রাজকুল দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন এবং ইতিহাসে তার কোনও উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না।

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সমকালীন বা উভয়ই একই ইতিহাসের সূত্র থেকে সৃষ্ট তা অবশ্যই বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে যে গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য হিসেবে গবেষকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেটি হল চর্যাপদ। চর্যাপদের পদসমূহ সম্পর্কে জানা যায় যে, সেগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সাধনার গূঢ় তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যাসম্বলিত যা গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হত। এইসমস্ত পদের বহিরঙ্গে সাধারণ জনজীবনের চিত্র ফুটে উঠত এবং তার গভীরে সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বকথাকেই এক আলো-আঁধারি ভাষায় ব্যাখ্যা করা হত, যার পাঠোদ্ধার শুধুমাত্র বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারাই সম্ভব ছিল এবং তা তাদের সাধনার বিষয় ছিল।

চর্যার পদসমূহে সমকালীন জনপদজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা প্রাচীন বঙ্গজনপদের চিত্রকেই নির্দেশ করে। প্রাচীন ত্রিপুরা ভূখণ্ড শুধুমাত্র পার্বত্য ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করেই ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা একসময় সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জনপদ একসময় হরিকেল-মণ্ডল নামেও পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সৃষ্টি হয়। আধুনিক গবেষণাকর্ম থেকে জানা যায় যে, বর্তমান ত্রিপুরার বেশিরভাগ অঞ্চলসহ কুমিল্লা নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চতুর্থ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত 'সমতট' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে 'হরিকেল' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ভূখণ্ড বঙ্গাল নামেও পরিচিতি লাভ করে। এই বঙ্গাল ভূখণ্ডের এক অংশ প্রাচীন ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল। চর্যার পদসমূহে 'বঙ্গাল' এবং এই ভূখণ্ডের অধিবাসী 'বঙ্গালী'র উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন—

'আজি ভুসুক বঙ্গালী ভৈলী।
নিঅ নারী ছাড়ি চণ্ডালী লেলী॥'

কিংবা 'অদ্বয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউই' — ইত্যাদি পদ তারই নিদর্শন।

চর্যার জীবনচিত্রসমূহকে বিশ্লেষণ করলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা ত্রিপুরার আদিবাসী জীবনচিত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। নীচে এই বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ

তুলে ধরা হল।

১. তাঁত বোনা ও চাঙারি তৈরি করা : —
'তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চঙ্গেড়া' (চর্যা-১০)
(এখানে এই অঞ্চলে বহুল প্রাপ্য বাঁশের ব্যবহারের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।)

২. মদ চোলাই করা :
'এক সে সুন্তিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।।' (চর্যা-৩)

৩. ধান, কার্পাস বোনা :
(ক) 'ধুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা'
(খ) 'কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা' (চর্যা-৫০)

৪. তুলো ধুনা ও মোটা কাপড় বোনা :
(ক) 'তুলা ধুনি ধুনি আঁসু রে আঁসু' (চর্যা-২৬)
(খ) 'আঁমু ধুনিধুনি নিরবর সেস্ক'

৫. গাছ কেটে কাঠের কাজ করা :
(ক) 'কাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ' (চর্যা-৫)
(খ) 'ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল' (চর্যা-৪৫)

এছাড়া চর্যাপদের আরও কিছু উদাহরণ তুলে দেওয়া যায়। যার পারিপার্শ্বিক ব্যাখ্যা করলে এই প্রত্যয়ও জন্মে যে, ত্রিপুরার সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন হিসেবে চর্যাকে মান্য করতেই হয়। চর্যার কিছু কিছু পদে যেমন পাই —

১. 'টালত মোর ঘর নাহি পরিবেষী' (চর্যা-৩৩)

২. 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী' (চর্যা-২৮)
মৌরঙ্গী পিচ্ছ পিরহিন গীবত গুঞ্জুরী মালী'

৩. 'কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস
বেড়িল হাক পড়অ চৌদীস' (চর্যা-৬)

প্রথম পদটির ব্যাখ্যায় পাই যে, টিলার উপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। এই পদটিকে অনুধাবন করলে আমরা দেখি যে টিলার উপরে বিচ্ছিন্নভাবে বসতি স্থাপন করে আমাদের এই রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা বহুকাল আগে থেকেই বসবাস করে আসছেন। দ্বিতীয় উদাহরণ থেকে পাই যে, উঁচু উঁচু পর্বতে শবর বালিকা বাস করে। পার্বত্য ত্রিপুরার ভূখণ্ডও এইরূপ উঁচু উঁচু পর্বতবেষ্টিত। এছাড়া এই ভূখণ্ডে যে প্রাচীন জনজাতি বাস করত তার মধ্যে শবর, হো, মুণ্ডা, বীরহোড় এরা তো ছিলই। এই পদে তো তাদেরই একটি জনগোষ্ঠীর বালিকার অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে। বনমোরগের পালক চুলে গোঁজা, কিংবা গলায় গুঞ্জাজাতীয় ফুলের মালা পরিধান করা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মহিলাদের অঙ্গরাগের একটি স্বীকৃত নিদর্শন। নৃতত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের কিরাত নামেও অভিহিত করেছেন। এই কিরাতরা মূলত ছিল শিকারজীবী। উদ্ধৃত তৃতীয় পদটিতে বনভূমিকে ঘিরে ধরে ধাওয়া করে পশু শিকার করার আদিম পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে শিকারিরা দলবদ্ধভাবে বনের হরিণ শিকার করে। চর্যাপদ থেকে এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ ধরে ধরে ব্যাখ্যা করা যায় যে, এর মধ্যে এমন বহু স্থানিক চিত্রের ও যাপনচিত্র পাওয়া যায় যা চর্যাপদের পটভূমি এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই প্রতীয়মান হয়েছিল বলে সিদ্ধান্তে আসা যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের একটি জনগোষ্ঠীর নাম চাকমা। এই চাকমা জাতি একসময় ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই বসবাস

করত। বর্তমানে এই জাতিগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশই পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বিচ্ছিন্নভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে, মিজোরাম ও মণিপুরে বসবাস করে আসছেন। এই চাকমা জাতিদের ভাষা চাকমাভাষা নামে পরিচিত। আপাতদৃষ্টে লক্ষ করলে এই ভাষা বাংলাভাষার অপভ্রংশ বলে মনে হয়। বিশেষত, চট্টগ্রামের যে বাংলা উপভাষা প্রচলিত অছে তার সঙ্গে চাকমাভাষার বেশ একটা নৈকট্য রয়েছে। চর্যাপদে ব্যবহৃত বহু শব্দ হুবহু চাকমা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। যেমন খুন্টি, সিয়াল, বাঞ্ছা, ছিনাল, ইত্যাদি বহু শব্দ এমনকি বাক্যগঠনের ক্ষেত্রেও প্রকরণগত মিল পাওয়া যায় চর্যাপদ ও চাকমা ভাষার মধ্যে।

পূর্বাহ্নেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গাল ভূখণ্ডের একটা অংশ একসময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চর্যার পদকর্তাগণের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছিলেন বঙ্গালের অধিবাসী। এই বঙ্গাল ভূখণ্ডের একাংশ একসময় ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চর্যার সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম ডোম্বী (চর্যা-১৪ রচয়িতা) ত্রিপুরার রাজা বলে গবেষকরা অনুমান করছেন। চর্যাকারদের কেউ কেউ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে তাঁদের বৃত্তিবাচক বা জাতিবাচক ছদ্মনাম ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন — কাঞ্চন, তাড়ক, তান্তি, তাপ্ত, গুণ্ডরী ইত্যাদি। ডোম্বীও সম্ভবত ছদ্মনাম বা উপাধি।

উপযুক্ত বিষয়গুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ত্রিপুরার বাংলা কাব্যচর্চার ইতিহাস বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সমকালীন। পাশাপাশি একথাও জোরালোভাবে বলা যায় যে, ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার বোধন হয়েছিল বাংলাসাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই। সেই হিসেবে চর্যাপদকেই ত্রিপুরা রাজ্যের সাহিত্যচর্চার আদি নিদর্শন হিসেবে মেনে নিতেই হয়।

খ্রিস্টিয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বলে গবেষকরা বিচার করে থাকেন। এই যুগেই চর্যাপদ রচিত হয়। চর্যাপদ ছাড়া এই সময়ে আরও একটি ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় এটি চর্যার পরে পরেই রচিত হয় এবং তার উপর চর্যার প্রভাব রয়েছে। এইসময়ে নাথধর্মচর্চা বাংলা বিশেষত পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বিকাশলাভ করে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন প্রণালীর প্রভাব নাথ ধর্মের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। গবেষকদের সিদ্ধান্ত যখন বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রায় বিলুপ্তির পথে বা হুমকির সম্মুখীন হয় ব্রাহ্মণ্যবাদের আক্রমণে সেইসময়েই বুদ্ধের ধ্যানী প্রতিমূর্তিটি শিব প্রতিকৃতিতে রূপান্তরিত হয় বৌদ্ধ সিদ্ধচার্যগণ শৈব যোগীতে রূপান্তরিত হয়ে আত্মগোপন করেন। ফলে বৌদ্ধদের যোগসাধনার প্রণালী শৈবদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়। নাথ যোগীগণ শৈবধর্মের অনুসারী। নাথগুরু হলেন গোরক্ষনাথ এবং তাঁর গুরু মীননাথ। নাথ ধর্মতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে আদিযুগের শেষার্ধে রচিত হয় 'গোরক্ষবিজয়', 'মীন চেতন' 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ইত্যাদি কাব্য। চর্যাগীতির সঙ্গে নাথসাহিত্যের অনেক বিষয়েই সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। চর্যাপদে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাকে বলা হয় সন্ধ্যাভাষা। নাথসাহিত্যেও এই সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়া চর্যাপদের মধ্যে কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে নাথসাহিত্যে তার ব্যবহার হতে দেখা গেছে। যেমন —

১. 'গুরু বোব সে সীমা কাল' (চর্যা - ৪০ সংখ্যক)

অনুরূপ — 'কালা ভাইএ গীত গাহে বোবা ভাই এ রহি সুনে'।

(গোরক্ষবিজয়)

২. 'বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে
পিটা দুহিঅই এ তীনি সাঁঝে
নিতি নিতি সিআলা সিহ সম জুঝই।

ঢেন্ডন পা এর গীত বিরলে বুঝই।' (চর্যা)

অনুরূপ — 'বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাঞ্জা
বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাজা।।
শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুঝে।
কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে।।' (গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস)

নাথ ধর্মকে বিশেষভাবে বাংলার ধর্ম বলে মনে করার কারণ নাথ সাহিত্যে যে সব স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাদের অনেকগুলি এদেশের। মীননাথ, জালন্ধরী পা ও কানুপা চর্যাগীতির লেখক বলে তাঁদের এই অঞ্চলের লোক বলে গ্রহণ করতে হয়। বঙ্গের রাজা গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচাঁদ) রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শিলালিপির (একাদশ শতক) সমসাময়িক বঙ্গালদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন, তাঁর সময় চর্যাগীতির রচনাকালের মধ্যেই পড়ছে।'

এখানে উল্লেখ্য যে, নাথসাহিত্যের নিদর্শন গোপীচন্দ্রের গানের পটভূমি ময়নামতী অঞ্চল পূর্বতন জেলা ত্রিপুরা বা সমতল ত্রিপুরার কুমিল্লা সন্নিহিত স্থান যা আজও বর্তমান। সমতল ত্রিপুরাসহ চাকলা রোশনাবাদ একসময় ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চর্যাগীতির টীকায় মীননাথের লেখা একটি চর্যাগীতির কিছু অংশ উদ্ধৃত আছে। এই মীননাথ হলেন গোরক্ষনাথের গুরু। গোপীচন্দ্রের গুরু হাড়িপা। মানিকচন্দ্রের স্ত্রী গোপীচন্দ্রের মা সিদ্ধা ময়নামতীর নামে স্থাননাম হয়েছে ময়নামতী। চর্যাপদের অনেক পরে এই কাব্যগ্রন্থদুটি রচিত হলেও এ দুটো কাব্যগ্রন্থ যে ত্রিপুরার নিজস্ব কাব্যসম্পদ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চর্যার পদকর্তাগণ এবং গোপীচন্দ্রের গুরুর নামের শেষে যুক্ত পা পদবীটি ত্রিপুরার আদি রাজাগণের নামের শেষেও যুক্ত থাকতে দেখা যায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে 'ফা' হিসেবে। ত্রিপুরার রাজা রহফা পরবর্তী সময়ে রত্নমাণিক্য নাম গ্রহণ করেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২২ খ্রি.) আমলে স্বয়ং মহারাজ স্বীয় উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষার কয়েকটি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। সেগুলো হল 'রামায়ণ' ও 'প্রেত চতুর্দশীর গীত'। এছাড়া দুটি জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থও ছিল যথাক্রমে 'উৎকল খণ্ড পাঁচালী' ও 'যাত্রা করনিধি'।

এই পর্যায়ে ত্রিপুরায় সাহিত্যচর্চা বলতে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদকর্মই বেশি লক্ষ করা যায়। এইসময় মহারাজ জগৎমাণিক্য, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী জাহ্নবী দেবী প্রমুখগণ সংস্কৃত গ্রন্থানুসারী কিছু বচনাদি রচনা করেন।

ত্রিপুরার ইতিহাসগ্রন্থলেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ উল্লেখ করেছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাজ প্রথম রত্নমাণিক্যের সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের সম্পর্ক শুরু হয়। তখন থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে প্রজাসত্ত্বের অধিকার লাভ করে মুসলমানগণও এখানে তাদের বসতির বিস্তার লাভ ঘটাতে থাকে। পরবর্তীকালে তাদের মধ্য থেকে কাব্যচর্চার প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়।

আনুমানিক ১৫৬০-১৬২৫ খ্রি. সময়কালে শেখচান্দ নামে একজন কবির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তিনি পাঁচখানা পুঁথি রচনা করেছিলেন। এই পুঁথিগুলি হল : ১. রসুল বিজয় ২. শাহ দৌলা ৩. কিয়ামতনামা ৪. হরগৌরী সংবাদ ৫. তালিবনামা। তিনি যে ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী ছিলেন তা তাঁর কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন — পরগণে পাইটকারা স্থানে গোঞাঞ সাল' যার অর্থ তিনি পাটিকারা পরগনায় বাস করতেন।

মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের (১৬৮৫-১৭১০) রাজত্বকালের সময়ে পিতৃব্য নরেন্দ্রঠাকুরের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নরেন্দ্রমাণিক্য নাম ধারণ করে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন এবং মহারাজা রত্নমাণিক্যের সাময়িক সিংহাসনচ্যুতির ঘটনাকে

কেন্দ্র করে চর্যার পরবর্তীকাল থেকে বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগ সূচিত হয়। মাঝখানের ১২০০ থেকে ১৩০০ সালের শেষ দশকপর্যন্ত এদেশে তুর্কী বিজয় ও ধ্বংসের কবলে পড়ে কোনোরকম নিদর্শন আর অবশিষ্ট থাকে না। আশঙ্কা করা হয় এই সময়ে সমকালীন সাহিত্যের বহু নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। ফলে এই সময়কালটা বাংলা সাহিত্যের অন্ধকারযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এর পরের সময় অর্থাৎ আনুমানিক ১৪০০ সাল থেকে ১৮০০ সালের শেষ অবধি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। সেই সময়ের অবিস্মরণীয় বাঙালি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মেধাবী ব্যক্তিত্ব চৈতন্যদেবের জীবৎকাল ও তার পূর্বাপর সময়কালকে চিহ্নিত করে মধ্যযুগকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। আনুমানিক ১৪০০-১৫০০ সাল প্রাক্‌চৈতন্য যুগ। ১৫০১-১৬০০ চৈতন্য যুগ। ১৬০১-১৮০০ পর্যন্ত চৈতন্যোত্তর যুগ। বাংলা সাহিত্যের এই মধ্যযুগেও ত্রিপুরা বাংলা কাব্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মহারাজ রত্নমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রত্নমাণিক্য তিনজন বাঙালিকে ত্রিপুরা রাজ্যে আনিয়ে জায়গীর ও নিষ্করভূমি দান করেছিলেন। এঁরা হলেন বড়ো খান্দব ঘোষ, পণ্ডিত রাজ এবং জয়নারায়ণ সেন। জয়নারায়ণ সেন ছিলেন একজন চিকিৎসক। রত্নমাণিক্যের পর মহারাজা ধর্মমাণিক্যের আমলে ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ পরগনার ঠাকুরবাড়ি গ্রামের অধিবাসী দুজন পুরোহিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর বাংলা পয়ার ছন্দে রাজমালা লেখেন। রাজমালার সারসংকলনে রেভারেন্ড লঙ উল্লেখ করেন, এই গ্রন্থটি পঞ্চদশ শতকে রচিত হয়। এটি প্রাচীন বাংলা কাব্যের একটি অন্যতম নিদর্শন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের আমলে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন উল্লেখ করেন — 'মহারাজা ধর্মমাণিক্যের শাসনকালে রাজমালা রচিত হয়েছিল। দুর্গামণি উজিরের রাজমালায়ও (এটি পরবর্তীকালে ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়) উল্লেখ রয়েছে, 'সুভাষাতে ধর্মরাজে রাজমালা কৈল,/রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল।' পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন, কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রমুখ এই অভিমতকে সমর্থন করেন। শেখ মহদ্দিন 'চম্পকবিজয়' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ড. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিহাসাশ্রিত 'বাংলা কবিতা গ্রন্থে' চম্পকবিজয় সম্পর্কে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে চম্পকবিজয়ের অসামান্যতা স্বীকার করিতে হয়। রাজমালা বর্ণিত ঘটনার সীমাকাল সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ইহা রচিত। গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে ভাষা অতিরঞ্জিত, কিন্তু চম্পকবিজয়ের ঘটনাকাল মাত্র একটি দশকে সীমান্বিত হওয়ায় ঘটনাবলি যতদূর সম্ভব যথাযথ বিবৃত হইয়াছে।'

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা-বঙ্গভূমি সহ সংলগ্ন চট্টগ্রাম-কাছাড় - কোচবিহার-আরাকান প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যসমূহেও সাহিত্যচর্চার জোয়ার এসেছিল। বিশেষ করে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় এইসব অঞ্চলে বাংলাসাহিত্যচর্চার এক বিশেষ বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল যা আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। আরাকান রাজসভায় দৌলতকাজী আলাওল সতী ময়না, লোর চন্দ্রানী, পদ্মাবতী, হুসেন শাহের লস্কর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর পরাগলী মহাভারত, ছুটি খাঁর মহাভারত, কাছাড়ের ডিমাসা রানি চন্দ্রপ্রভা দেবীর নির্দেশে অনুবাদকৃত বৃহগ্নারদীয় পুরাণ, রাজপরিবারের সদস্যদের সৃষ্ট বাংলা কাব্য। কোচবিহারের রাজসভায় বাংলাভাষার পৃষ্ঠপোষকতা, ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছিল।

ত্রিপুরায়ও রাজা গোবিন্দমাণিক্যের শাসনামলে (১৬৬৫-৭৫) 'বৃহগ্নারদীয় পুরাণ' পুঁথিটি রচিত হয়। এই পুঁথিটির রচয়িতার নাম জানা যায় না। চন্দ্রোদয়

ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এই পুঁথিটি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রি.) কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়।

সপ্তদশ শতকে শেরবাজ নামে একজন কবি ১. 'ফক্করনামা বা মালিকার হাজার ছওয়াল' ২. 'কাশেমের লড়াই' এবং ৩. 'ফাতিমার সুরতনামা' নামে তিনখানি কাব্য রচনা করেন। একধরনের হেঁয়ালির প্রশ্নোত্তরধর্মী রচনা হল ফক্করনামা 'কাশেমের লড়াই' কারবালার ময়দানের ঐতিহাসিক যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত। 'সুরতনামা' অভিব্যক্তিমূলক রচনা।

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর (১৬৫৭-১৭২০)-এর 'জেবল্‌মুলক্ — শামরুখ' নামে একখানি পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিখানি প্রণয়োপাখ্যানমূলক এবং আনুমানিক ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত। কবি শেখ সাদী মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮২-১৭১২) 'গদ্যমালিকা সম্বাদি' নামে একখানি পুঁথি রচনা করেন। তাঁর পুঁথিতে চম্পক রায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় তিনি চম্পকরায়ের কর্মচারী ছিলেন। ১১২২ ত্রিপুরাব্দে যে এই পুঁথিটি রচিত হয়েছিল তা পুঁথির ভণিতাতে স্পষ্ট —

'পড়িয়া বুঝিয়া সব শাস্ত্রের উদ্দেশ
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ।'

মূলত এটি একটি ফারসি পুঁথির অনুবাদ।

মুহম্মদ রফিউদ্দিন নামে আর একজন কবিও 'জেবল মুলক - শামারুখ' নামে একখানি পুঁথি রচনা করেন। তিনি কুমিল্লার নারানঞা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুঁথিটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে রচিত বলে গবেষকমহলের ধারণা। রফিউদ্দীন এই পুঁথিটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচনা করেন।

আনুমানিক ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ শিক পরগনার কৈয়রা গ্রামে সমসের গাজির জন্ম হয়। ১৭৪৮ খ্রি. ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী সমসের গাজির অধিকারভূক্ত হয়। তখন থেকে বারো বছর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। সমসের গাজির জীবনের আকস্মিক উত্থান-পতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মৃত্যুর পর শেখ মনুহর গাজি নামে এক পল্লিকবি রচনা করেন 'গাজিনামা'। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে নোয়াখালির সেরেস্তাদার মৌলবি খবির মুদ্রিত করেন এই গাজিনামা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময়ে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অনুবাদসাহিত্য সৃষ্টি হতে থাকে। এসব অনুবাদের ক্ষেত্রে যে হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থাদি ও পুরাণ রয়েছে তেমনি মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট অনেক আরবি ও ফারসি গ্রন্থেরও অনুবাদ করা হয়েছে। সে সময়ের শাসকবর্গের ধর্মীয় সহাবস্থান ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতায়ও একটা ইতিবাচক চিহ্ন রেখে গেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। এসব অনুবাদসাহিত্যে ধর্মীয় ভক্তিরসের সৃষ্টি যেমন রয়েছে, তেমনি বীররস ও পারিবারিক জীবনঘনিষ্ঠ প্রণয়রসেরও উপলব্ধি করা যায়।

মহারাজা রাজধর মাণিক্য ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়েই ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে মণিপুরের রাজপরিবারের সম্পর্ক সৃষ্টি। তিনি মণিপুর রাজা জয়সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এরপরে মহারাজা কাশীচন্দ্র ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে মণিপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এরপরে মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যও মণিপুরকন্যা বিবাহ করেন। মণিপুর রাজপরিবারের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্কের সূত্র ধরে ত্রিপুরা রাজপরিবারের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করে। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য থেকে শুরু করে বীরবিক্রম মাণিক্যের কাল পর্যন্ত সকলেই বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী ছিলেন। ফলে রাজন্য সদস্যদের মধ্যে, বৈষ্ণব

সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা এইসময় থেকে শুরু হয়ে যায়।

মহারাজা রাজধর মাণিক্যের নির্দেশে ১৭৮৫ খ্রি. থেকে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রামগঙ্গা বিশারদ 'কৃষ্ণমালা' রচনা করেন। পণ্ডিত দ্বিজ রামগঙ্গা শর্মার লিখিত 'কৃষ্ণমালা' কাব্যগ্রন্থটি মধ্যযুগে রচিত ত্রিপুরার বাংলা কাব্যের একখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের (১৭৬০-১৭৮৩) ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে বসার পর জয়ন্ত চন্তাইর মুখে তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের বীরত্বের কাহিনি শুনে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার আগ্রহের সঞ্চার হয়। তাঁর নির্দেশে ব্রাহ্মণ রামগঙ্গা শর্মা কৃষ্ণমাণিক্যের সংঘাতপূর্ণ জীবনী অবলম্বনে 'কৃষ্ণমালা' রচনা করেন। রাজন্যপ্রভাবের কারণে গ্রন্থটিতে বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনা ও পদাবলি সাহিত্যের আঙ্গিকের ছাপ পড়ে।

এই কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালের মধ্যে কোনও এক সময়ে তা রচনা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। কবি তাঁর পাণ্ডিত্যের দুর্বলতার কথা কাব্যের শুরুতেই উপস্থাপন করেছেন।

'পণ্ডিত জনেরে কহি বিনয় বচন।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ করিবা শোধন॥
সাধুয়ে পাইলে গ্রন্থ সদর্থ করয়।
যদি দোষ দেখে তাহে উদ্ধারিয়া লয়॥
গুণ না দেখিয়া দোষ দেখে খল জনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই দেখ বিদ্যমানে।।'

কৃষ্ণমালা কাহিনি রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত হওয়ার ফলে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণাও রয়েছে কাব্যটিতে।

ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল ১৬৮২-১৭১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর রাজত্বকালে তাঁর পিতৃব্য দ্বারিকা ঠাকুর বিদ্রোহ ঘোষণা করার ফলে সাময়িককালের জন্য (১৬৯৩-৯৪ খ্রি.) রত্নমাণিক্যের রাজ্যচ্যুতি ঘটে সাময়িক কালের জন্যে। 'চম্পকবিজয়' কাব্যে এই ঘটনাকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। 'চম্পকবিজয়' কাব্যের কবির নাম শেখ মহদ্দিন। এছাড়া কবির আর কোনও পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ নেই। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র মীর খাঁ। বিদ্রোহী নরেন্দ্রমাণিক্যের তাড়া খেয়ে চম্পকরায় চট্টগ্রামে পালিয়ে গিয়ে মীর খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। মীর খাঁর প্রচেষ্টায় চম্পকরায় পুনরায় ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মীর খাঁর আদেশেই নাকি এই চম্পকবিজয় কাব্য রচনা করেছেন কবি। একথা তিনি কাব্যের বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন —

১. 'মীর খাঁ যে ভুবনে পূজিত
তাহান আদেশ ধরি শিরস্ত্রাণ মান্য করি
মহদ্দিয়ে করিল রচিত'
২. 'শ্রীযুক্ত মীরখাঁন প্রতাপে ভাস্কর
কহে হীন মহাদ্দিয়ে তান আজ্ঞাপর

নূরনগর পরগনার অন্তর্গত বিদ্যাকূট নিবাসী রামনারায়ণ দেব ১২০৬ সালের ১৮ বৈশাখ 'চম্পকবিজয়' কাব্যটি নকল করেন। এই কাব্যটির নকল পুঁথি ব্যতীত মূল পুঁথি খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর বঙ্গের সাহিত্যে ইতিহাসাশ্রিত কাব্যরচনার যে প্রবণতা ত্রিপুরার বাংলা কাব্যসমূহে পরিলক্ষিত হয়েছিল গাজিনামা, কৃষ্ণমালা, চম্পকবিজয় প্রভৃতির মাধ্যমে সেই ধারাটিই অল্প কিছুকাল পরেই আধুনিক

বাংলাকাব্যের পথিকৃৎ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখর কাব্যে পরিপুষ্টি লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর প্রভাবে বাংলাদেশের বুকেও লাগে তার দোলা। এই শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-আমেরিকায় এই পরিবর্তন শুরু হয়। শুরুতে গতি কিছুটা মন্থর হলেও সহসাই তা গতি সঞ্চারিত হয়ে শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্রুততর হতে থাকে।

রেনেসাঁর ফলে ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হল তা বাংলাকবিতার বিষয়কেও পালটে দেয়। সে সময়ের পরাধীন ভারতবর্ষের উত্তাল ইতিহাসের প্রভাবও বাংলাকাব্যে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৯), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) প্রভৃতি ঘটনা বাংলা কাব্যের ভাষাকেও পালটে দেয়। নতুন চেতনার কাব্য রচনায় হাত দেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণ।

বাংলা রেনেসাঁ পর্বের একটা পর্যায়ের অর্থাৎ উন্মেষ পর্বের সমাপ্তি ঘটে যখন রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধান হয়। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তাঁর দীর্ঘ সাতান্ন বছরের জীবনে তিনি বাংলার রেনেসাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল মধ্যপর্যায়, জাতীয় চেতনার উন্মেষের পরিপূর্ণতা পর্যন্ত দেখে যান। মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের সময়েই বাংলা কাব্যসাহিত্যে গীতিকবিতার উন্মেষ ঘটে। কবির একান্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই গীতিকবিতার মধ্য দিয়ে। তার সাথে পরিকল্পনা ও সৌন্দর্যের যুগলবন্দিতে কবিতায় এক সংগীতময় রসমূর্তি রূপ ধারণ করে। এইসময়ে বাংলাকাব্যে আত্মপ্রকাশ ঘটে অনুভূতিপ্রবণ, সৌন্দর্যপিয়াসী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর। বিহারীলাল কলকাতার মতো নাগরিক পরিমণ্ডলে থেকে নিসর্গসৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে আনন্দের অন্বেষণ করে গেছেন। বীরচন্দ্র যে বছর সিংহাসন লাভ করেন (১৮৬২) সে বছর বিহারীলাল চক্রবর্তীর সংগীত শতক প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে কবির কাব্যগ্রন্থসমূহ — বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ-সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭১), সারদামঙ্গল (১৮৭৯), সাধের আসন (১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দে মাসিক পত্রে প্রকাশিত), বাউল বিংশতি (১২৯৪)। কবির শ্রেষ্ঠ ও সার্থক কীর্তি হল সারদামঙ্গল (১৮৭৯)। কাব্যটি আখ্যানকাব্যের আকারে লেখা। কাব্যটিতে দেবী সারদা বা সরস্বতীর সাথে কবির আনন্দ, বেদনা, বিরহমিলনের মুহূর্তগুলি অনির্বচনীয় প্রকাশের ব্যঞ্জনায় অনন্যরূপে ফুটে উঠেছে। বিহারীলাল যে নতুন ধারার সূত্রপাত করেন, পরবর্তীকালে বেশ কিছু কবি তাঁকে অনুসরণ করেন। এই ধারার অন্যান্য কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখ প্রসিদ্ধ। গীতিকবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নারীপ্রেম। তাঁদের কবিতায় নারীর বিচিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের জীবন ও মননের উপর যে বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের প্রভাব পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কারণ রাজপরিবারের সদস্য হওয়ার ফলে বহিঃত্রিপুরার সঙ্গে অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অসম্ভব ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন বিদ্বান ও বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত। তিনি ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, মণিপুরী এবং ত্রিপুরী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ছিলেন বিজ্ঞানমনস্কও। এছাড়া তিনি ছিলেন সুকবি ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে নিপুণ ও কলারসিক। তাঁর আমলেই তাঁর উদ্যোগে ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ নিবিড় হয়। তাঁর সময়ে ত্রিপুরার রাজদরবারে বহু জ্ঞানীগুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল। বীরচন্দ্র মাণিক্য সম্বন্ধে তৎকালীন ত্রিপুরার

বিখ্যাত কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা বলেছেন —

"স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র ছিলেন বাংলার বিক্রমাদিত্য। তিনি একাধারে বৈষ্ণব, কাব্যরসিক কবি এবং সংগীত ও ললিতকলাবিদ ছিলেন। এহেন রসিক চূড়ামণি, সাহিত্যের পাকা জহুরী মহারাজ বীরচন্দ্রের দরবার বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশে ভরপুর ছিল।" (দেশীয় রাজ্য)

রবীন্দ্র স্নেহধন্য ত্রিপুরা রাজপরিবারের সন্তান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন —

'নবযুগের প্রবর্তক গুণী মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তাঁর বাংলাভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন, সুকবি, বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সংগীতরচয়িতা, সুরস্রষ্টা, উর্দু ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় আলাপে সক্ষম, কূটনীতিপরায়ণ, বাক্‌পটু ও সর্বোপরি তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ও ফটোগ্রাফার।'

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন একজন কবি ও কাব্যরসিক। বৈষ্ণব সাহিত্যেও ছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি তাঁর অগ্রজ মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৫০-১৮৬১) বৈষ্ণবপদ সংকলনে সে সময়ের বিখ্যাত চিত্রকর আলম কারিগরকে দিয়ে কয়েকটি ছবি করিয়ে সংযোজন করিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি রাজদরবারের গ্রন্থাগারে অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল একট সুবৃহৎ বৈষ্ণবপদাবলিসংকলন করার। এজন্য তিনি এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে সমগ্র পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কবি নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক সংকলিত হস্তলিখিত 'গীতচন্দ্রোদয়' পদাবলি গ্রন্থটির 'অষ্টকাল-রাগানুরাগ' খণ্ড পর্যন্ত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত হয়েছিল।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'ব্রজাঙ্গনা' এবং 'মেঘনাদ বধ' কাব্যদুটি পাঠ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ লিখে গেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি রয়েছে গীতিকাব্য। এগুলোর ভাষা ও কাব্যসৌন্দর্য যথেষ্ট রয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে —

১. অকালকুসুম (১৮৮৬) — এই কাব্যটি মহারানি মনমোহিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লিখিত। অধিকাংশ কবিতাই প্রেমপর্যায়ের।

২. হোরি (কোনও সন উল্লেখ নেই) ১৩০২ ত্রিং-এর পূর্বে কোনো একসময় দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে লিখিত গীতিকাব্য। এই গ্রন্থটিতে শাস্ত্রনীতি মেনে ৩৪টি সংগীত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'হোরি' কাব্যে ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে যেমন বিভিন্ন পর্যায় থাকে সেরকম এই কাব্যেও বন্দনা, পূর্বরাগ অভিসার, মিলন, বিরহ, উৎকণ্ঠা জাতীয় বিবিধ পর্যায়ের পদ রয়েছে। তাঁর একটি অভিসারবিষয়ক পদে পাই —

'চরণে চালনে দোলিছে গগনে
হেমপৃষ্ঠ বেণী সঘনে ঘন
কর্ণে কুন্তল মণি ঝলমল
যেমন সৌদামিনী ঝলকে ঘন।'

৩. শ্রীশ্রীঝুলনগীতি (১২৮৮ ত্রিং অর্থাৎ ১৮৭৮ ইং রচিত/ ১৩০২ ত্রিং অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রি.) ঈশানচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে রয়েছে 'রাজবাড়ী — নতুন হাবেলী, ২৮ বৈশাখ ১৩০২ ত্রিপুরা। উৎসর্গ স্বর্গীয়া ভানুমতী দেবীর করপঙ্কজে।' শ্রীশ্রীঝুলনগীতিতে ৫০টি সংগীত রয়েছে যার মধ্যে

আটটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন —

"ঝুলনগীতি মহাজন পদাবলীর ছায়া লইয়া লিখিত। পদের ভাষা অপ্রচলিত ও দুরূহ তাহাতে অধিকার জন্মান সুকঠিন, গানগুলি যে তত সুবিধার হইয়াছে আশা করা যায় না। ইহা আমার প্রথম জীবনের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র এবং শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তিদায়ক বলিয়াই যেভাবে লিখিত হইয়াছিল তাহার কোন অংশ সংশোধন না করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

কাব্যটি তিনি মহারানি ভানুমতীদেবীকে উৎসর্গ করেছেন —

'রাই কানু বিলসন প্রেমলীলা রসায়ন
তব স্মৃতিময় এই কবিতা আমার
হৃদি সিক্ত আঁখিনীরে উদ্দেশ্যে তোমার করে
সঁপিলাম সমাদরে গীতি উপহার।'

৪. উচ্ছ্বাস (১৮৮৬ খ্রি.-র পূর্বে কোনো একসময় রচিত) কাব্যটি প্রেমপূর্ণ জীবনের মধুর অনুভবকে কেন্দ্র করে রচিত। মহিষী ভানুমতীদেবীর মৃত্যুর পর যে হাহাকার তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করছিল, দ্বিতীয়া মহিষী মনমোহিনীদেবীর সান্নিধ্যে এসে সান্ত্বনা লাভ করেছিল। জীবনে এক নতুন উপলব্ধি লাভ করেন তিনি। 'উচ্ছ্বাস' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি তাঁর এই নবজীবন লাভের ছাপ বহন করে। প্রেমের উচ্ছ্বাসকেই ব্যক্ত করে।

৫. প্রেম মরীচিকা (১৮৮৬ খ্রি.-র পূর্বে কোনো সময়ে রচিত) — প্রয়াত মহারানি ভানুমতীকে উদ্দেশ্য করে লেখা বিরহের কবিতা রয়েছে এই গ্রন্থে। কাব্যটিতে কবির প্রিয়বিরহজনিত মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

৬. সোহাগ (১২৯৩ খ্রি. অর্থাৎ ১৮৮৩ ইং) মহারানি মনমোহিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতাসংকলন এটি। আগরতলার বীরযন্ত্রে ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কাব্যটির আখ্যানপদে বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাসের একটি পদের আংশিক উদ্ধৃত রয়েছে —

'রূপের সায়রে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবন বনের মাঝে মন হারাইল।।'

কাব্যটিতে মোট ২২টি দীর্ঘকবিতা রয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতার আলাদা শিরোনামও রয়েছে। আবার প্রতিটি কবিতা একাধিক স্তবকে বিন্যস্ত। কাব্যটিতে পত্নীপ্রেমজনিত হৃদয়ের আবেগ নানাভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এখানে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি ঘটেছে। দ্বিতীয়পত্নী আগমনে তাঁর হৃদয়াবেগ শান্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু তিনি তাঁর প্রথমার প্রেমের স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারেননি —

'সেই বিদায়ের সেই সজল নয়ন
উছলিছে হৃদি সিন্ধু,
অনন্ত মুকুতা বিন্দু,
প্রতি হৃদে গ্রন্থি-সূত্রে করেছি গ্রন্থন।'

বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যে পদাবলি সাহিত্যের ধারাটি বিশেষ করে অনুসৃত হয়। এছাড়া সমকালীন বাংলা গীতিকবিতার সৃষ্টিকালের প্রভাবও তাঁর কবিতায় পড়েছিল। মানবজীবনে ভালোবাসা যে গভীর অনুভবের বিষয়, বিচ্ছিন্নতার বেদনায় যে অন্তর দীর্ণ হয়, নিঃসঙ্গতা এসে ঢেকে দেয় কবির সুকুমার হৃদয় তারই ব্যথাতুর প্রকাশ ঘটেছে কবির কাব্যে। এছাড়া রবীন্দ্রকাব্যেরও কিঞ্চিৎ

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের মহিষী ভানুমতীদেবী ১৮৮২ সালে অকালে পরলোক গমন করেন। এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত থেকে এসে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। স্ত্রীবিয়োগে ব্যথাতুর কবি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করে গভীরভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ কবিপ্রতিভার স্ফুরণ যে এই কবির মধ্যে রয়েছে তা অনুভব করেন। তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি রাধারমন ঘোষকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে পাঠিয়েছিলেন কবিকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে। সম্ভাবনাময় তরুণ কবিকে সেদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল বীরচন্দ্র মাণিক্যের উদ্যোগে। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১২ই ফাল্গুন কিশোর সমাজের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্মাননা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনের সম্পর্কসেতু তৈরি হয়েছিল।

ত্রিপুরার আধুনিক যুগের প্রবর্তক বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে কৈলাসহরে যে শোকসভা হয়েছিল সেখানে কুকি নেতা বানখাম্পুই একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। এতেই অনুমান করা যায় বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যপ্রতিভা সেদিন ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিকশিত হয়েছিল। বাংলাসাহিত্য যখন আধুনিকতার দ্বারপ্রান্তে তখন বিহারীলাল গীতিকবিতার ধারাকে বিশাল ঐশ্বর্য দান করেছিলেন। এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থান করে এই আরণ্যজনপদে কুয়াশার সামিয়ানার নীচে অবস্থিত পাহাড়ের চূড়ায় উষাকালীন সূর্যোদয়ের রক্তিমাভা দেখে ত্রিপুরার কাব্যচর্চার আধুনিক যুগকে আহ্বান করার যে আরণ্যদোয়েলের শিস দিয়ে গেছেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তারই ধ্বনিসুষমা পরবর্তী কবিদের বাংলাকবিতার অঙ্গনে সমানভাবে সাহসের সঙ্গে চলার জন্যে।

মহারাজা বীরচন্দ্র যে আধুনিকতার সূচনা করে গিয়েছিলেন সমগ্র ত্রিপুরার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রশাসনে তার ঢেউ সেদিন রাজঅন্তঃপুরেও আছড়ে পড়েছিল। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের নিবিড় সান্নিধ্য থেকে তাঁর তিন কন্যা অনঙ্গ মোহিনীদেবী, গিরীন্দ্রবালাদেবী ও মৃণালিনীদেবী প্রত্যেকেই সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁরা তিনজনই ছিলেন কবি। ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলাকবিতার ক্ষেত্রে বহির্জাগতিক স্বীকৃতি মূলত এই সময় থেকেই শুরু হয়। তার পূর্বে বীরচন্দ্র মাণিক্য ও অন্যান্য কবিগণের রচনায় যে ইতিহাসাশ্রয়ের প্রাবল্য, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ, রাজপরিবারের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারস্বরূপ বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবিতা, বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের সূচনাকালের কাব্যধারা তথা গীতিকবিতার অনুসরণই ছিল বিশেষ অনুষঙ্গ। বীরচন্দ্র মাণিক্য ব্যক্তি অনুভূতির প্রকাশের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। তাঁর গীতিকবিতাসমূহের মাধ্যমে তা অন্তঃপুরের নিভৃতচারিণী কবিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

সেদিন মহারাজকন্যা অনঙ্গমোহিনীদেবীর কবিখ্যাতি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বাংলাসাহিত্যের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে স্থান করে নিয়েছিল। কবি অনঙ্গমোহনী দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা' প্রকাশিত হয় বিগত শতাব্দীর প্রথমদিকে। ১৯০২ সালের ২রা জানুয়ারি অর্থাৎ ১৭ই পৌষ এ রাজ্যের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ফলক। এদিন প্রকাশিত হয় কবি অনঙ্গমোহিনীদেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা'। এটি তাঁর স্নেহময় পিতা বীরচন্দ্র মাণিক্যের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়। এ সময় তাঁর স্বামী জীবিত ছিলেন। এই কাব্যের ভূমিকাংশে তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করেছেন —

'পিতঃ

এ নহে কবির গাঁথা কুসুমমালা

সুবাসিত চির মধুময়,
এ কেবল শুষ্কফুল — বিহীন সুবাসমধু
মলিন বিশীর্ণ দলচয়
তবু পিতঃ উৎসর্গিনু — স্বর্গীয় চরণে তব
অতি ক্ষুদ্র মম উপহার
অশ্রুজলের বিন্দুসহ — ভকতি প্রণাম এই
লহ পিতঃ দীন তনয়ার'

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা'র কাব্যবিচার করে মহারাজা বীরচন্দ্রের সভাকবি মদনমোহন মিত্র লিখেছেন — "স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা রাজ্যে কবিতা ও গীতে কাব্যের দেশব্যাপী স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন, রাজদুহিতার কবিত্বে স্বভাবতঃ নিত্যপদানুসারিণী।

'কণিকা' আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার কয়েকটি কবিতা বড়োই হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছে, কোমল ভাষায় প্রাণের আবেগ ফুটিয়াছে। রাজকুমারীকে আমি একান্ত স্নেহ করি। ইহার কবিতা পড়িয়া সুখী হই। ইনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন। আমি ইহার রচিত উপহারটি পড়িয়া চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি নাই। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, ইনি সুস্থ শরীরে প্রতিভা বিস্তার করিয়া আজীবন কবিতার সেবা করুন।"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন — "... আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকুমার অথচ কলানৈপুণ্যও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ —" (চিঠি-১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৮ বাং/ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা)

'কণিকা'-র কবিতাগুলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা। এই কাব্যের মূল সুর প্রকৃতি ও প্রেম। কাব্যে সন্নিবিষ্ট ১২টি কবিতার মধ্যে পাঁচটি কবিতা (উষা, মধ্যাহ্ন, নিশীথ সংগীত, বর্ষা, বসন্ত উষায়) প্রকৃতিবিষয়ক। বিষাদভাবনার প্রকাশ 'অভিজ্ঞান', 'স্মৃতি' এবং 'অন্তিম বাসনায়'। বৈষ্ণবীয় চেতনায় লেখা হয়েছে তিনটি কবিতা 'বিরহ', 'মিলন' ও 'যুগলরূপ'। অনঙ্গমোহিনীর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা 'মহাশ্বেতা'। সপ্তম শতকে রচিত বানভট্টের 'কাদম্বরী' কাব্য এবং কামিনী রায়ের 'মহাশ্বেতা' কবিতার মাধ্যমে হয়তো তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এই কবিতা রচনায়। কাদম্বরী গ্রন্থের উপনায়িকা গন্ধর্বকন্যা মহাশ্বেতার ধ্যানমগ্না রূপ অংকনে কবি অনঙ্গমোহিনীদেবী এক অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। স্বতন্ত্রধর্মী এই কবিতায় —

'মনোহর চন্দ্রপ্রভা গিরিবর মূলে
মহেশ মন্দির
লতায় পাতায় ঘেরা দাঁড়াইয়া অনিমিখ,
স-বিষাদ নীরব গম্ভীর,
অবিরাম নিরঝরে ঝরে কবি ঝরঝর
যেন রে বালার দুঃখে কাঁদে গিরিবর।'

— এক ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনটি কবিতায় (অভিজ্ঞান, স্মৃতি, অন্তিম বাসনা) কবি-মনের উচ্ছ্বাস ও বিষণ্ণতার সুরটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। শেষের তিনটিতে (বিরহ, মিলন, যুগলরূপ) বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। পিতার লালন এবং রবীন্দ্র ছত্রচ্ছায়া ও বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভাকবি মদনমোহন মিত্রের অনুপ্রেরণা তাঁকে কবিতার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর অন্য দুটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'শোকগাথা' (১৯০৩) মোট ২৩টি বিভিন্ন ধরনের কবিতায় সমৃদ্ধ। এই কাব্যগ্রন্থ রচনার এক বৎসর আগে তাঁর স্বামী গোপীকৃষ্ণ দেববর্মনের মৃত্যু

হয়। এই মৃত্যুবেদনায় দীর্ণ হৃদয়ের অভিব্যক্তি এই কাব্যগ্রন্থের সর্বত্র ধ্বনিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের কিছু পঙ্‌ক্তিমালা এখানে তুলে ধরা যাক —

১. 'গিয়াছে সকলি মম কিছু নাহি আর,
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার' (চিরস্মৃতি)

২. 'প্রতারণাময় এ সংসার
হেথা শুধু জীবনের পরীক্ষার স্থান' (মৃত্যু)

৩. 'তাই ভাবি মানব জীবন
নহে বালকের খেলা
ক্ষণিক মায়ার মেলা
এ নহে গো নিশার স্বপন' (মৃত্যু)

কবি অনঙ্গমোহিনীদেবীর তৃতীয় ও শেষ কাব্যগ্রন্থ 'প্রীতি' (১৯০৭) তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতির নিদর্শন। 'শোকগাথা' কাব্যগ্রন্থে বিরহবেদনার যে হাহাকার ধ্বনিত হয়ে বহির্মুখী হয়েছিল তাঁর মন, এই কাব্যে এসে তা অনেকটা শান্ত ও সমাহিত রূপ নিয়েছে। তাঁর অন্তর্মুখী অভিগমনের ফলে এই কাব্যটি পরিণতি লাভ করেছে। অত্যন্ত সংযত বাক্যবিন্যাসে স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশ্যে এই কাব্যগ্রন্থটি নিবেদিত হয়েছে —

'তোমার কণ্ঠের সুরে বাঁধিয়া লইয়া বীণা
প্রতি তারে দিয়াছি ঝংকার
গাবে না সে অন্য গান তব প্রিয় নাম বিনা
গীতি-প্রীতি সকলই তোমার।'

কবি তাঁর শেষ কাব্যগন্থে বিশ্বনিয়ন্তাকে খুঁজে পান। সর্বত্র তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শ অনুভব করেন। কবি মিনতি করেন —

'চাহি না গো ক্ষণিকের বৃথা স্নেহ বৃথা ভালোবাসা,
পারি যেন সঁপিবারে এই পদে স্নেহ-প্রেম-আশা' (নিশীথে)

বিরহ-যন্ত্রণা শেষে তিনি জাগতিক বন্ধন ত্যাগ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চান। মৃত্যুর পরপারে চিরসুন্দরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন তাঁকে —

'এসো ওগো এসো আমার মরণ
এসো হে সুন্দর, সৌম্য সুনীল বরণ' (মরণ)

এখানে তাঁর ভাবনার সঙ্গে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর ভাবনার সঙ্গে যেন মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে কবি বলেছেন —

'দেখা দাও, দেখা দাও
আলো নিবিবার আগে একবার
হে সুন্দর, মোরে দেখা দাও।'

ব্যক্তিমনের সুগভীর অনুভূতি যদি গীতিকবিতার মৌল ধর্ম বা প্রাণ বলে স্বীকৃত হয়, তাহলে কবি অনঙ্গমোহিনীকে গীতিকবি বলেই স্বীকার করে নিতে হয়। তাঁর কবিতাগুলোও গীতিকবিতার পর্যায়ে পড়ে। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে অনঙ্গমোহিনীদেবী ত্রিপুরায় সৃষ্ট বাংলাকবিতায় এক উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে প্রয়াত হয়েছেন। রবীন্দ্র প্রশংসাধন্যা এই কবি ত্রিপুরার বাংলাকবিতার ক্ষেত্রে এক নূতন শতকের সূচনা করে গেছেন।

বীরচন্দ্রের অপর দুই কন্যা গিরীন্দ্রমোহিনীদেবী ও মৃণালিনীদেবী বহু কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের কোনও বই প্রকাশিত না-হওয়ায় তাঁদের কবিপ্রতিভা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের (১৮৯৬-

১৯০৯) কবি, গীতিকার, শিক্ষানুরাগিনী পত্নী মহারানি তুলসীবতীদেবীও কাব্যরচনায় সুনাম অর্জন করেছিলেন।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভাকবি মদনমোহন মিত্রের কন্যা কুমুদিনী বসু ছিলেন অনঙ্গমোহিনীদেবীর সমসাময়িক। তিনি বঙ্গে মহিলা কবিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর রচিত 'লহরী' (১৮৮৭) ও 'আভা' (১৯০২) দুটি কাব্যই সেদিন সাহিত্যসমাজে প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এরপর প্রায় চার দশকের দীর্ঘসময় ধরে ত্রিপুরায় রচিত বাংলাকবিতা তেমন কোনও দাগ সৃষ্টি করতে পারেনি। এই সময়ের মধ্যে রেহেন্নাদ্দিন, কমলপ্রভাদেবী, নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মন, সতীশচন্দ্র দেববর্মন, হররাণী দেববর্মন ও চারুবালা দত্ত প্রভৃতি কবিগণ কিছুটা কাব্যচর্চার নিদর্শন রেখেছেন।

বাংলাকবিতার সুদীর্ঘ বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাসসৃষ্টিতে সমাজের উচ্চকোটি অংশের ব্যক্তিবর্গ, রাজন্য আনুকূল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু উনিশ শতকের পর থেকে সমাজের উচ্চস্তরীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুটা ভাঁটার টান পড়ে। রাজসভায় কবিতাপাঠের প্রাচীন ঐতিহ্য অন্তর্হিত হয়, সেইসঙ্গে হারিয়ে যায় রাজসভার কবিসমাজও। সেই জায়গায় স্থান নেয় সাময়িকপত্রসমূহ। পাশাপাশি গদ্যচর্চারও একটা দিগন্ত খুলে যায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সবুজ পত্র'-তে কবিতা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হত। প্রকাশিত হতে থাকে পরপর বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' (১৯৩৫), সুশীল রায় সম্পাদিত মাসিক কবিতাপত্র 'জীবাণু' (১৯৩৮), এর আগে প্রকাশিত হয় দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় 'কল্লোল', বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্পাদনায় 'প্রগতি' (১৯২৭)। তাই তিরিশের দশকে দেখা যায় যে, সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবি কোনো-না-কোনো বিখ্যাত সাহিত্যপত্রের সঙ্গে নিয়মিতভাবেই জড়িয়ে ছিলেন। বাংলা কবিতার নূতন বিবর্তনে কবিতাপত্র সেসময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। কবিতা পত্রিকার নামে এই সময়ের কবিতাচর্চার যুগ বিভাজন হয়েছিল। 'কল্লোল'-কে কেন্দ্র করে কল্লোলযুগ ও পরবর্তীকালে 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব ঘটে।

এই সময়ে বাংলাকবিতায় আধুনিকতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়। বিশ শতকে পরপর সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বমানসের এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। সর্বত্র মূল্যবোধের সংকট দেখা দেয়। যার প্রভাব সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও এসে পড়ে। বিশ্বসভ্যতা এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। এই পরিবর্তনকে বলা হয় আধুনিকতা। রবীন্দ্র-জীবৎকালেই কবিতায় আসে রবীন্দ্রবিরোধিতা বা রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। আধুনিক জীবন ক্রমশ যন্ত্রনির্ভর ও নগরমুখী হয়ে উঠতে থাকে। আধুনিক কবিতায় নূতন ধরনের চিন্তা, নূতন শৈলীর আগমন ঘটে। এসময়ের কবিদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের মধ্যে লক্ষ করা যায় —

১. রবীন্দ্র বিরোধিতা বা রবীন্দ্র-মুক্তির প্রয়াস
২. আন্তর্জাতিক বোধ ও মানবিকতা
৩. প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যের কাব্যশিল্পের প্রতি আসক্তি
৪. প্রাচীন মূল্যবোধের প্রতি শঙ্কা ও বর্জনস্পৃহা
৫. নাগরিক চেতনা
৬. প্রেম ও মৃত্যু সম্পর্কে নূতন চিন্তা
৭. কাব্যে আঙ্গিকের আধুনিক রূপ দান ইত্যাদি।

মূল বাংলা কাব্যজগতে বিশাল আলোড়ন ও পরিবর্তন সূচিত হলেও এসময় ত্রিপুরার বাংলা কবিতায় তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। তার প্রধান কারণ হল, সারা বাংলাদেশ তখন স্বাধীনতার আন্দোলনে উত্তাল। সাধারণ জনগণ

মোটামুটি জেনে গেছেন স্বাধীনতা আসন্ন। লর্ড কার্জনের বঙ্গবিচ্ছেদের (১৯০৫) প্রচেষ্টা সে দফায় ব্যর্থ হলেও স্বাধীনতার সময় বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কার্যত হয়ও তাই। তার আগে কলকাতায় নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে জনমনে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। ভদ্রাসন ছেড়ে দিয়ে নূতন ঠিকানার দিকে রওনা হবার জন্য মানসদ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে থাকে বাঙালি জনসমাজ। এবং একদিন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ত্রিপুরারাজ্য ভারতভূক্ত হয়। ফলে বাস্তুহারা বাঙালিরা দলে দলে প্রবেশ করতে লাগলেন এরাজ্যে। এসময় সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি লক্ষ করা যায়নি। স্থানীয়ভাবে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, এম এ আব্দুল মতিন, সমাচার চক্রবর্তী প্রমুখ স্থানীয় পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতায় অনেকটা রবীন্দ্র কবিতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। পেশায় দরজি এই কবি জীবনাচরণে ও লেখালেখিতে প্রবল রবীন্দ্রানুসারী ছিলেন। পাঁচ-এর দশকে আর যারা কাব্যচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, অজিতবন্ধু দেববর্মা, শক্তি হালদার, অনিল ভট্টাচার্য, খগেশ দেববর্মন, অশ্বিনী আঢ্য প্রমুখর নাম করতে হয়। কলকাতা থেকে কর্মসূত্রে ত্রিপুরায় এসে অধ্যাপক রণেন্দ্রনাথ দেব তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আগরতলায় তিনি 'সাহিত্যবাসর' নাম দিয়ে এক সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র গড়ে নিয়মিত কাব্যপাঠ ও সাহিত্য আলোচনা ইত্যাদি চালিয়ে যান।

বৃহত্তর বঙ্গে যেমন বিভিন্ন সমায়িকপত্র ও কবিতাপত্রের মাধ্যমে বাংলা কাব্যচর্চা বৃহত্তর পরিমণ্ডল খুঁজে নিয়েছিল, সেরকম ষাটের দশকে সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন ও খগেশ দেববর্মনের সম্পাদনায় স্থানীয় কবিদের কবিতা নিয়ে 'প্রান্তিক' নামে এক সংকলন প্রকাশিত হয়। 'প্রান্তিক'-এর কবিরাই এই রাজ্যের কাব্যক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় বাঁক নিতে পেরেছিলেন। রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, অপরাজিতা রায়, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন, করবী দেববর্মন, অশোককান্তি দাশগুপ্ত, সত্যব্রত চক্রবর্তী, কিরণশংকর রায়, খগেশ দেববর্মন ও প্রদীপ চৌধুরী — এই এগারোজনের কবিতা নিয়ে 'প্রান্তিক' (১৯৬১) প্রকাশিত হয়। 'প্রান্তিক'-এর কবিদের মধ্যেই আধুনিকতার লক্ষণ নিয়ে, দৈহিক প্রেমচেতনা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অবচেতনের বিস্তার ও পরাবাস্তবের প্রভাব নিয়ে পরিশ্রমী শব্দ ব্যবহারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই সময়ের কবিতা।

এই কবিদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন কাব্যচর্চা করেছেন। অপরাজিতা রায়, করবী দেববর্মন আজও কাব্যচর্চা করে চলেছেন। খগেশ দেববর্মন কলকাতা থেকে 'প্রান্তিক' পুনরায় প্রায় নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন। এই কবিকুলের মধ্যে রণেন্দ্রনাথ দেব ও সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন ছিলেন শক্তিমান কাব্যপ্রতিভার অধিকারী। রণেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম বৃষ্টির জল'-এ কবি কবিতার আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ রেখেছেন।

'চৈত্রের প্রথম বৃষ্টি, পথে পথে ভাঙা ডালপালা,
দু-একটি ফুলের পাপড়ি সিক্ত ঘাসে, মাটিতে নরম
কীটের পায়ের চিহ্ন, ধুলিহীন সকালের রোদ
কাঠবিড়ালির সঙ্গে কিছুক্ষণ করে গেল খেলা'

(প্রথম বৃষ্টির জল)।

বৃষ্টি ও ঝড় বিধৌত সকালের নৈসর্গিক বর্ণনার চিত্রকল্পে নূতনত্ব আরোপের প্রয়াস রয়েছে এখানে। এ সময়ের আর একজন কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন। তিনি রোমান্টিক কবি। নির্জনতা ও নিম্নস্বর তাঁর কবিতার বিশেষ লক্ষণ। সরল নিরাভরণ বাক-প্রতিমায় এক নিঃসঙ্গতার বাতারণ সৃষ্টি হয় তাঁর কবিতায় —

'জলের ভেতর ডুবিয়ে দিলাম ফুলগুলি

উঠল না আর কোথাও ভেসে ভালোবাসার মুকুটমণি
চারিধারেই পাথর আমার, স্থবির স্থির
মরণকান্না শোনে না আজ দেয়ালগুলি
যেমন তারা সদাই ছিল উচাটন'

(জলের ভেতর বুকের ভেতর)

একটা নিভৃত যন্ত্রণা, রিক্ত আর্তি ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায়। ভালোবাসাহীনতা তাঁকে যেন মৃত্যুচেতনায় আচ্ছন্ন করে। ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'জলের ভেতর বুকের ভেতর'। শব্দচয়নে তাঁকে জীবনানন্দকে অনুসরণ করতে দেখা যায়। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'মধ্যরাতে স্বাধীনতা' (১৯৮৭)।

সমকালের কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী এ রাজ্যের বাংলাকবিতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘসময় ধরে তিনি ত্রিপুরায় কাব্যচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। ১৪০০ বঙ্গাব্দে, কবিপক্ষে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'জলপ্রপাতের কাছে নতজানু' প্রকাশ করেন, আর এক শক্তিমান কবি শঙ্খপল্লব আদিত্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে (নির্জন ধুনকর) কবি মিহির দেব লিখেছেন, "তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে আসলে তাঁর সমগ্র জীবন-দর্শনটাই। যদি এককথায় বিজনকৃষ্ণের পরিচয় দিতে হয়, তবে সেই কথাটি, ঋজুতা। মেরুদণ্ড সোজা রাখা। তাঁর বহু কবিতায় তাই আমরা দেখি সোচ্চার হতে, বিদ্রোহ করতে, এমনকি যুদ্ধ ঘোষণা করতেও। কারও ভ্রূকুটির পরোয়া না করেই প্রতিবাদ বা সমালোচনা করার অনুকরণীয় সাহস তাঁর কবিতার এক বিবেকী গুণ।" তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে ১৯৬২ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত সময়কালের কবিতা ধরা আছে। তাঁর কবিতা —

'চাইনে গজদন্ত মিনার অথবা
দিস্তের পর দিস্তে জুড়ে যোজনার খতিয়ান
বদলে দাও
একখণ্ড বস্ত্র, দুয়েক মুঠো অন্ন, কিঞ্চিত অক্ষরজ্ঞান;
কিছু ফুল আঙিনায়; এক চিলতে খড়ের চাল
মাথার উপরে, কিছু কিছু স্বাধীনতা আর
আর পৃথিবীর কোলে জীবলীলা শেষ হলে আরো
কিছু সৌহার্দ্য-মাটি ও মানুষের।।'

প্রান্তিক জনজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাকেই ফুটিয়ে তোলে।

এ সময়ে আরও দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল 'নীল পাহাড় সোনালি ঢেউ' এবং 'এক আকাশ তারা' (১৯৬৩)। এগুলোকে কেন্দ্র করে যাঁরা কাব্যচর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীবাস ভট্টাচার্য, প্রবীর দাশ, মৃণালকান্তি কর, মৃণাল পাল, ধীরেন বসাক, আশিস সিংহ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কবিতায় শক্তিমান উপস্থিতির জানান দিয়েছিলেন মৃণালকান্তি কর। মেধাবী এই কবি 'সীমান্তপ্রকাশ' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশও করতেন। সেসময়ে সেই কাগজে কবিতাও ছাপা হত। শারদসংখ্যা যত্নসহকারে প্রকাশ করা হত স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকদের লেখালেখি নিয়ে। তাঁর প্রথমদিকের কবিতায় তাঁকে ভালোবাসায় দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রকাশের ভঙ্গিমায় ঋজু মনে হয় —

'বাঁশি দেখেছ বাঁশ দেখনি,
হাসি দেখেছ অশ্রু দেখনি,
কিছু দেখেছ, কিছু দেখনি,
বিদেশ গেছ, দেশ দেখনি।
আসলে চোখের দেখাই দেখেছ,
দেখার চোখে কিছুই নেই।' (অন্তরেতে তাকাও যদি)।

পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন তিনি আর কাব্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকেননি। রাজ্যের একটি প্রথম শ্রেণির দৈনিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত থেকে ত্রিপুরার সংবাদজগৎকেও সমৃদ্ধ করে গেছেন। বাংলা ভাষার কবিতাপ্রেমীরা একজন শক্তিমান কবির কবিতা থেকে বঞ্চিত হলেন। আসলে একটিমাত্র কাব্যসংকলন ছাড়া (ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা ১৯০৭-১৯৯২) তাঁকে নিয়ে আর কোথাও আলোচনা হয়নি। সম্ভবত পাঠকবর্গের স্বীকৃতির অভাবেই কবিকে কবিতা থেকে পথান্তরিত করেছে। তিনি তাঁর কবিতায় সরল সাদামাটা ভাষায় বলে উঠেছেন —

'তুমি আসবে বলেই
শিউলি ফুটেছিল,
স্থলপদ্ম রং ছড়িয়েছিল,
কাশফুলে নদীতীর সাদা
হয়ে গিয়েছিল;
আকাশটা একরাশ নীল ছড়িয়েছিল।
তোমাকে বরণ করে নিতেই
প্রকৃতি বরণডালা সাজিয়েছিল,
শিউলি-বিছানো পথ ছিল
শিশির-ভেজা পদ্ম নুয়েছিল,
কাশবন ছিল প্রণামের মুদ্রায়,
শঙ্খ হাতে দাঁড়িয়েছিল মেয়েরা,
দীপ ছিল, ধূপ ছিল, সব ছিল ...
কিন্তু তুমি এলে না।'

— প্রতীকী বর্ণনায় কবি এভাবেই তুলে ধরেন। 'তুমি এলে না' নামের কবিতাটিই সম্ভবত তাঁর শেষ প্রকাশিত কবিতা। এটি ১৯শে ভাদ্র ১৪১৩-তে শারদীয় 'প্রান্তর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

সত্তরের দশকে এরাজ্যে কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়। বেশ কয়েকটি কবিতাপত্রিকা এবং সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এরাজ্যেও কবিতা নিয়ে অনেকটা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তরুণ কবিরা প্রকাশ্য রাস্তায় আগরতলার পোস্টাপিস চৌমুহনীতে তাঁদের কবিতা পাঠ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 'গ্রুপ সেঞ্চুরি' নিয়ে আসে এক নতুন উন্মাদনা। এই সময়ের অগ্রজ কবিদের কেউ কেউ এবং অনুজ কবিদের অনেকেই আজও কবিতাচর্চার সঙ্গে নিরলস জড়িয়ে রয়েছেন।

১৯৭৩-এ প্রকাশিত 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'-তে পূর্বে আলোচিত অগ্রজ কবিদের কয়েকজনকে নিয়ে মিহির দেব, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, প্রদীপ চৌধুরী, শঙ্খপল্লব আদিত্য, পীযূষ রাউত, মানস দেববর্মন, প্রদীপবিকাশ রায়, স্বপন সেনগুপ্ত প্রমুখ তাঁদের কাব্যচর্চার স্বাক্ষর রাখেন। সেইসঙ্গে ছিলেন অপরাজিতা রায়, করবী দেববর্মণ, সিরাজুদ্দীন আহ্‌মেদ, শিশির সিংহ প্রমুখ। এইসময়ে প্রকাশিত হয় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'পূর্বমেঘ' এবং মানস পাল সম্পাদিত 'সৈকত'। পূর্বমেঘ 'সুনির্বাচিত কবিতাসংকলন ১৯৭৬' এবং সৈকত একটি বিশেষ কবিতাসংকলন প্রকাশ করে। মূলত সাতের দশকে ত্রিপুরা রাজ্যে লিটল্ ম্যাগাজিন বিপুল পরিমাণে প্রকাশিত হতে থাকে। পূর্বমেঘ, সৈকত ও অন্যান্য সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে একঝাঁক তরুণ কবি সেসময় উঠে আসেন। অসীম দত্তরায়, সমরজিৎ সিংহ, দীপঙ্কর সাহা, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, নকুল রায়, রাতুল দেববর্মন, তীর্থপ্রসাদ চক্রবর্তী, মানস পাল, মৃন্ময় সেন, সুনীল ভৌমিক, দেবাশিস ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু নাগ, কল্যাণ গুপ্ত, পার্থ সেনগুপ্ত, নিলিপ পোদ্দার, ননীগোপাল চক্রবর্তী,

প্রত্যুষ দেব, সন্তোষ রায়, কিশোররঞ্জন দে, সন্‌জিৎ বণিক, সুনির্মল পাল, সেলিম মুস্তাফা, পুলক দাস, পুলকেন্দু চক্রবর্তী, হিমাদ্রি দেব, বিশ্বজিৎ দেব, অজিতা চৌধুরী, পূর্ণেন্দু গুপ্ত, কল্লোল দত্ত, বিধু দেব, মাধব বণিক, প্রদীপ দত্তচৌধুরী, অশোকানন্দ রায়বর্ধন, লক্ষ্মণ বণিক, শুভেশ চৌধুরী, দিলীপ দাস, সদানন্দ সিংহ, অরুণ বণিক, অরূপ দত্ত, পার্থ রায়, অনিলকুমার নাথ, মন্টু দাস প্রমুখ। এঁদের কেউ কেউ আটের দশকে কাব্যচর্চা শুরু করেন।

'দ্বাদশ অশ্বারোহী'-র কবিদের মধ্যে প্রত্যেকেই স্বকীয়তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাকবিতার অঙ্গনে। এঁদের মধ্যে কল্যাণব্রত চক্রবর্তী আজও লিখে চলেছেন। ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকারে প্রণামের ইচ্ছা হয়'। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'লোকালয়ে উদ্ভাসিত মুখ' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪-তে। মাঝে তাঁর নির্বাচিত কবিতাসংকলনের পর ২০০১-এ প্রকাশিত হয় 'যেখানে থামতে হবে'। এই ভূখণ্ডের বাংলা কবিতায় কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী একটি অবশ্য উচ্চারিত নাম। লিনোকাট-এর প্রচ্ছদের মধ্য দিয়ে যাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল, কবিতাপথে আজও শোভনমুদ্রণের কালে প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে তিনি ত্রিপুরার বাংলা কবিতাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে চলেছেন। কবিতাকে কেন্দ্র করে তাঁর সুখ, দুঃখ নিয়ে তিনি বলেন, "কেবল তোমাকেই ছুঁয়ে থাকতে চাই"। একসময় তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি তরুণ কবিদের মুখে মুখে ঘুরত —

'পদচিহ্নহীন মাঠ, মৃতের শিয়রে যেতে ভালো লাগে। অন্ধকারে
প্রণামের ইচ্ছা হয়।'

অথবা

'ধর্ষণে বিধ্বস্ত রাত মূর্খ তুই
ফুঁ দিয়ে নিবাস্, হায় বাপ্, দেখ্ দেখ্
রক্ত লেগে আছে তোর নাবালিকা বালিকার দেহে।
কবে সব আকস্মিক খুন হয়ে যাবে এই জেলের ভেতরে —
তাই এত আলো, একসঙ্গে এত ফ্ল্যাশ
ক্যামেরার ভিড়।'

কবির কাব্যভাষায় একটি একান্ত নিজস্বতা রয়েছে, যেটা অনেকটা সংবাদধর্মী। তারই মধ্য থেকে তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে আরণ্যক দ্যুতি। এরকমই বর্ণনাত্মক কবিতার নিদর্শন পাই —

'মাঝরাতে আবার পুড়েছে গ্রাম, পাড়াশুদ্ধ লোক
কে কোথায় জঙ্গলে পালিয়েছে, কাঁদবে ভয়ে
বজ্রমুষ্ঠিতে ছেলের মুখ চেপে আছে মা,
লোকে কুকুর পোষা ছেড়ে দিয়েছে বড়ো সুরমায়।'

(সিন্ধুকুমার যাবার আগে। যেখানে থামতে হবে)

কবিতায় কবির এই স্বকীয় বয়ান বাংলাকবিতায় অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব করার দাবি রাখে।

এই সময়ের আর একজন কবি স্বপন সেনগুপ্ত তাঁর 'নান্দীমুখ' কবিতাপত্রের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ত্রিপুরারাজ্যে বাংলাকাব্যচর্চা ও তার লালন করে গেছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ পাখি', 'এ আমার ভিখিরি হাত নয়', 'ধুলোমাখা পিড়িতে একাকী'। তাঁর কবিতায় সংশয় ও দ্বিধা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হৃদয়ের সংক্ষুব্ধ যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় ভাষা পায়। মধ্যবিত্তের সুখকে কবি শ্লেষাত্মক বাক্য প্রয়োগে তুলে ধরেন —

'আমাকে বলুন, ঠোঁটে করে আপনার কথা
বয়ে নিয়ে যাব। সময়ের আগে দৌড়ে দৌড়ে যাব।

বিশ্বাস করুন, এই কাজটা আমাকেই দিন'
(আমাকে বলুন। ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী)।

আর প্রাপ্তির তৃপ্তিকে এভাবে প্রকাশ করেন —

'ডাকো কোকিল ডালে ডাকো
আহ্লাদে আটখানা হয়ে ডাকো,
আজ নতুন পাজামা কিনবেন রতীশবাবু'।

বাংলাকবিতায় এক অন্যধরনের কাব্যভাষা সৃষ্টি করেছেন কবি শঙ্খপল্লব আদিত্য। কবিতার ছন্দোময় লালিত্যকে বর্জন করে একেবারে আটপৌরে গদ্যভাষায় তিনি তীব্র ও শানিত বাক্যপ্রয়োগে কবিতাকে করে তুলেছেন সৈনিকধর্মী। শঙ্খপল্লবের কবিতায় হাংরি যুগের কবিতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে তাঁর নিজস্ব কাব্যদার্ঢ্য প্রকট হয়ে ওঠে। একরকম নিভৃতচারিতার কারণে দীর্ঘদিন তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া কবি যশ প্রতিষ্ঠার বাইরেই থাকতে চান। জানুয়ারি ১৯৯৬-তে তাঁর অল্পসংখ্যক কবিতা নিয়ে নতুন প্রজন্মের কবিরা অগ্রজকে সম্মানদানের ঐতিহ্যস্বরূপ 'বাংলা কবিতা' থেকে প্রকাশ করেন 'ভালোবাসার মনাক্কা ও খাসা কিসমিস'। তাঁর নিভৃত কিছু শ্লোকপ্রতিম শব্দবন্ধ—

১. 'যাদের যায় তাদের সবই যায়
সমতলেও যায়, পাহাড়েও যায়
তিতাসের পাড় ভাঙে গোমতীর পারে।'
২. 'কাঞ্চন টিলার মেয়েদের হাতে ভেজে দেয়া ভুট্টার বীজ'
৩. 'সলিল দেবর্মনের হাতে মিহি-কাটা-সুপুরির নকশী পান খেয়ে আমি
আবার
আড্ডায়'
৪. 'আজ বাঘিনী ডলার খাচ্ছে, কাল খাবে দিনেমার
বর্ষপঞ্জী গুলে খাচ্ছে নৈমিত্তিক ছারখার।'

শঙ্খপল্লব ত্রিপুরার কবিদের রাজর্ষি।

ছয়ের দশকে (১৯৬২) বুলেটিন প্রকাশের মাধ্যমে শুরু হয় 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলন। যথাক্রমে মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও দেবী রায় এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন ত্রিপুরার কবি প্রদীপ চৌধুরী। হাংরি আন্দোলনের প্রভাব প্রদীপ চৌধুরীর হাত ধরে ত্রিপুরার কবিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল 'চর্মরোগ' (১৯৬৪), 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' (১৯৬৪), 'চৌষট্টি ভূতের খেয়া' (১৯৭১), 'কালো গর্ত' (১৯৮৩) ইত্যাদি।

দীর্ঘসময় ধরে এই রাজ্যে যাঁরা বাংলা কবিতা লিখে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে পীযুষ রাউতের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। তাঁর কবিতা ত্রিপুরার পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে বৃহত্তর বাংলাভাষী কবিকুলের কাছেও পরিচিতি লাভ করেছে। রোমান্টিসিজম-এর সঙ্গে বস্তুবিশ্বের সমন্বয় এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষের পথে অতিক্রমণ তাঁর কবিতার বিশেষ লক্ষণ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ' ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত 'জন্মজুয়াড়ি'। তাঁর এ দুটি কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কবি স্বপন সেনগুপ্ত বলেছেন — "... বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ' — এই কবির মেধার শরীরে বিষণ্ণতা মোক্ষম দ্রাক্ষাফলটির মতো অশ্রুর রস ভরা, উত্তরকাব্য 'জন্মজুয়াড়ি'-তে তা আরও নস্টালজিয়ায় বিধুর, শান্তিসন্ধানী এবং অভিমানী।"

শক্তিমান কবিকুল কবিতায়ও শক্তি জুগিয়ে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে। যার ফলে এই রাজ্যে সৃষ্ট বাংলাকবিতাকে আর আলাদাভাবে চিহ্নিত হতে হয়

না। বাংলাকবিতার ঘরে-বাইরে তখন চলছে আন্দোলন। হাংরির পর শ্রুতি, ধ্বংসকালীন, প্রকল্পনা, নিও লিট মুভমেন্ট, থার্ড লিটারেচার, মালভি আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে কবিতায় অনবরত চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাঙা-গড়া। আর অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবেও এসেছে নানা জটিলতা। নকশাল আন্দোলন, দেশের বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জরুরি অবস্থা, খাদ্যসহ দেশের আর্থিক সংকট একটা অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই সমস্তকিছুর প্রভাব ত্রিপুরারাজ্যে এসে পড়ে। মার্কসীয় দর্শন ও চিন্তাচেতনায় ঋদ্ধ কবিদের মধ্যে এসময় যাঁরা প্রচণ্ডভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তাঁদের মধ্যে সিতাংশুশেখর দাস ও অনিল সরকারের নাম করতে হয়। রাজনৈতিক ছড়া রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। শ্রেণিচেতনা তাঁর কবিতায় বারবার ধ্বনিত হয়। কবিতার মাধ্যমে কবি ব্রাত্যজনের পাশে সহযোদ্ধা হয়ে দাঁড়াতে চান। এছাড়া এই রাজ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কবিতার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ভাষ্য ছাড়াও তাঁর কবিতায় প্রেম ও রবীন্দ্র অনুরাগ এক হয়ে ঝরে —

'তোমার চোখের পাতায় আছে
পাখিদের আনাগোনা আর
আকর্ষণীয় মুগ্ধ কোলাহল
তবুও তুমি নাকি কতকাল একা আছ।
যদি চাও, আমি দিতে পারি
একটি কোমল করপদ্ম
একটি বিস্তীর্ণ দিঘির ঝিলমিল
আর রবীন্দ্র কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি —
"সখি ভাবনা কাহারে কয়"।
(ভালোবাসা কারে কয়/ শারদীয় প্রান্তর ১৪১৩)।

এই সময়ের আর একজন ছড়ায় সাবলীল — কবি অনিলকুমার নাথ।

কয়েকজন মহিলা কবি, যথাক্রমে অপরাজিতা রায়, করবী দেববর্মন এবং অরুন্ধতী রায় বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁদের ছাপ রাখেন। এঁদের মধ্যে অপরাজিতা রায় একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসমালোচক। ত্রিপুরার কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি পরিশ্রমী মননশীল প্রবন্ধ রয়েছে। করবী দেববর্মন ১৯৫০ সালে বীরবিক্রম কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'তে লেখালেখি শুরু করেন। কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল, 'লুণ্ঠিত সময় সীতা', 'মেরুদণ্ড দাও', 'কিছু স্বগতোক্তি কিছু ব্যক্তিগত সংলাপ', 'কবিতা আমার সময়-অসময়', 'কবিতাসংগ্রহ', 'সৃজনে উৎসবে' ইত্যাদি। সমকালের আর একজন কবি অজিতা চৌধুরী। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'নিসর্গের দিনলিপি'।

কবিতায় তীক্ষ্ণধী শব্দশৈলী নিয়ে এসেছেন কবি নকুল রায়। ১৯৭৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে তাঁর চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। চৌদ্দতম গ্রন্থটি — 'মৃত্যুঞ্জয়, তুমি কখন হবে' (২০০৭) কবিতা ও নাটকের সমাহার। তিনি তাঁর কবিতায় অনবরত বাঁকের মধ্য দিয়ে গেছেন। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তিনি কবিতাকে নিয়ে। প্রথমদিকের কবিতায় অভিভাবকধর্মী যে দীর্ঘ বচনভঙ্গিমা তিনি ব্যবহার করে আসছিলেন, শেষের দিকে তা যেন অনেকটা সংযত ও মিতবাক। তাঁর কবিতা —

'আমার হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে একটি কপাট সিমকার্ড
সময়ে-অসময়ে ডেকে ওঠে — শালীন! শালীন!
চুম্বনের পূর্বভাস, শিস্ এবং মধ্যভুবনের স্পৃহা
পাথরে শান দেয়ার সময় ছুরির রাত্রি নিভে যায়,

রোদ ঝলসে ওঠে অস্ত্রের মুখে
কায়া থেকে ছায়া দীর্ঘ হলেই বেলা অসম্পূর্ণ
তখনই সিমকার্ড প্রয়োজন দুঃখ জাগানোর ছলে'

(সিমকার্ড মৃত্যুঞ্জয়, তুমি কবে হবে)।

শুরু থেকেই দেখা গেছে তাঁর কবিতা নির্মাণকৌশলে নিপুণ ও ঋদ্ধতায় উজ্জ্বল। তরুণ কবিদের কাব্যচর্চায় তিনি আজও আশ্রয়তাঁবু।

কিশোররঞ্জন দে-র কবিতায় এক নিজস্ব ভাষাশৈলী রয়েছে। তাঁর কবিতায় গল্পকথনের একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং অনায়াসে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কবিকে পাথর ছুঁড়ে মারো'। তিনি অনেকটা বিবৃতির মোড়কে কবিতা রচনা করেন এবং পাঠকের হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে সেই বিবরণের অন্তর্লীন ঢেউ তোলেন।

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য যুগসেচতন, সময়সচেতন কবি। সত্তরের উত্তাল দশকে যখন কবিতায়ও সৃষ্ট হয় বিভিন্ন আন্দোলন, সে সময়কালে 'পূর্বমেঘ' কবিতাপত্র এবং পরবর্তীতে 'গ্রুপ সেঞ্চুরী'-র মাধ্যমে তিনি এরাজ্যেও এক আন্দোলনের চেতনা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ সময়কাল বাংলা কবিতার ক্রিজে থাকলেও কবি লিখেছেন অত্যন্ত কম। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উপদ্রুত বসন্তে' প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। এরপর বেরিয়েছে 'এখন কথাবার্তার সময়'। তাঁর কবিতায় তিনি বলেন —

'আমাকে একটু স্বাভাবিক জল এনে দাও
চৌচির হোক অহল্যা মাটি চাই উপদ্রবহীন
জীবন হে অর্জুন।'

আমাদের চিরন্তন পুরাণচরিত্রের আকৃতিতে তিনি এভাবে নতুন বয়ানে জীবনের জন্য হৃদয়ের যে আর্তি তাকেই প্রকাশ করেন।

আর-এক কবি রাতুল দেববর্মন। তাঁর কবিতায় ত্রিপুরার ভূমিজ ঘ্রাণ স্পর্শ করে যায় আলতোভাবে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'খোঁয়াড়ের শব্দকল্প', 'পাশাপাশি হাঁটি' এবং 'শাখানটাং-এর অবাক বালক'। তাঁর কাব্যে পৃথিবী থেকে মহাপৃথিবী ভালোবাসায় পরিযায়ী হয়। মৃত্যুর নীল পাখির মধ্য দিয়ে নক্ষত্রের অমরত্ব আসে এইভাবে —

'আমাকে নিয়ে যাও বলে —
উঠোনে নীলিমা টাঙিয়ে ইশারা করে দূরের আকাশ
আরও মহাশূন্যতায়
কে কত বেশি শুশ্রূষায় স্বচ্ছল করে
শরীরে বৃষ্টি এনে জলমগ্ন করে দেয়
মনে পড়লে ভালোবাসা বড়ো বেশি
দৈহিক চেতনা পায় —
এভাবেই নক্ষত্র আমাকে গ্রহণ করে
অন্ধকার গ্রীবার ছায়ায় ঢেকে রাখে।'

(শূন্য কাছে টানে। ভাষাসাহিত্য, ফেব্রুয়ারি ২০০৭)।

সমগ্র ত্রিপুরারাজ্যকে হঠাৎ চমকে দিয়ে কবিতার জগৎ থেকে আকস্মিকভাবে বিদায় নিতে হল যে কবিকে, তিনি হিমাদ্রি দেব। তাঁর একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টিজল' প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে বিদায় নিতে হয় জীবন থেকে, ভুল চিকিৎসার কারণে। কবিতায় এক স্বকীয় ভাষা-ভূগোল ও চিত্রকল্প, আভরণহীন বিন্যাস নিয়ে সৃষ্টিকর্মে নিরত ছিলেন তিনি। ভুলো মন, আদ্যন্ত কবিস্বভাবের হিমাদ্রি জীবনচর্যাতেও বেঁধে নিয়েছিলেন কবিতার ঘরদোর। তাঁর নিজস্ব ভাষার নিদর্শন --

'খরার গুণে গুঁড়ো হইল প্রজাপতির পাখা
যাইতে যাইতে শেষ হয় না পথ কেবলই আঁকা
বানাইন্যা ঘর শূন্য হইল নদীতে নাই জল
কোথায় যাইমু কারে কইমু মঞ্জিলা গো বল্।'

কবিতার জন্য তাঁর বানাইন্যা ঘর শূন্য করে দিয়ে যেতে হল তাঁকে নিরুদ্দেশের পথে আর বাংলা কবিতা আশাহত হল আর একবার।

এই সময়ের সর্বোচ্চ আলোচিত কবি দিলীপ দাস। সাতের দশক থেকে দু-হাজার এগারো পর্যন্ত তাঁর একের পর এক — 'সময় ছুটছে', 'জল ছুঁয়ে আছে এপার ওপার', 'মাস্তুলে মেঘের পতাকা', 'আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাব বলে', 'মেঘজীবন', 'স্তব্ধ মেঘ উড়ে যায় নিরন্ন দুপুরে', 'উপেক্ষিত জানালায় রোদ (অনুবাদ কবিতা), 'রৌদ্রের আড়াল', 'ধুলোস্ত্রোত্র', 'বিপিনমাঝির নাও', 'বিষাদযোগ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দিলীপের কবিতায় যেমন মেধা লীন থাকে, মননের গভীরে তেমনি তাঁর কবিতায় কৌমজীবনের জলজ স্মৃতি, অরণ্যের রক্তাক্ত চিৎকার আর বেদনার স্বতোৎসারে ক্রমোৎক্রমণ লক্ষিত হয়। দ্রোহের তাপ এবং নাগরিক বিপর্যস্ততার বিষণ্ণতা কবিতায় এক সৌম্যমেদুর অনুভব সৃষ্টি করে। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ থেকে সাম্প্রতচেতনা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে —

'বিষাদের বাড়িতে কেউ থাকে না।
তার একা বসবাস। দিন কাটে
রাত্রির নৈঃশব্দ্যে; রাত কাটে দিনের জাগরণে।
তাকে কেউ ডাকে না। নিজেকে নিয়ে তার একা সন্ন্যাস'
(রিক্ত কথা)।

'সবই প্রভুর ইচ্ছা। আপনি যে
প্রভু অন্তপ্রাণ, এটা প্রধানমন্ত্রীও জানেন,
আই এম এফ-ও জানে।'

তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'রিটায়ারমেন্টের পরে'।

'কালো ঘোড়ার গান' (১৯৮৩), 'নদীমাতৃক' (১৯৯০), 'আঁধার শ্লেটের বর্ণমালা' (১৯৯৯), 'ঘরে কেউ নেই' (২০০১), 'এই আমার আছে' (২০০৩), 'শূন্যে আমি একা নই' (২০০৭), 'শুভরেখা' (২০০৮) এই কাব্যগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়েছে কবি সন্তোষ রায়ের। গ্রুপ সেঞ্চুরী-র অন্যতম সৈনিক সন্তোষ রায় দীর্ঘসময় ধর্মনগরে রয়েছেন। নিরন্তন কবিতাজীবন যাপনের পাশাপাশি তিনি সেখান থেকে 'জলজ' নামে একটি সাহিত্যপত্রও নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছেন। সেখানে তাঁদের সাহিত্যের আড্ডা 'সাতদিন'-এ পৃষ্ঠপোষকতা করছেন পরবর্তী প্রজন্মের তরুণদের। তাঁর কবিতা তাঁর নিজের বলয় অতিক্রম করে দর্শনের দিকে যাত্রা করে। অনিত্য জীবন, পরিবর্তনশীল মনোচেতনা কবিতাকে অনেকটা বাউলা-নিস্পৃহ করে রাখে —

'স্নান আর জলের মাঝখানে
তুমি ছিলে।
তোমার রচনা পড়লে, মনে হয়, তাই।
ডোবে না কিছুই
ভেসে ওঠে ছাই'। (অতলকথা/ শূন্যে আমি একা নই)

কিংবা,

'চামল ছায়া নিভিয়ে রেখেছে আলো
ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ভিক্ষুদল

শান্ত সৌম্য হাওয়ায় চক্ষু মুদে আসে।
এই বৃক্ষে কি হতে পারে বোধি?
বলতে কি পারে, আমাকে সেই শস্য দাও?' (শুভরেখা-১৩)।

এ সময়কালের কবিদের মধ্যে যাঁরা এখনও কবিতার কোজাগরি মহিমায় অনিদ্র চর্যায় নিমগ্ন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই করতে হয় কৃত্তিবাস চক্রবর্তীর নাম। সাতের দশকের শেষদিকে তাঁর বাংলাকবিতার পদচারণা শুরু। প্রতিটি কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁর অন্বিষ্ট গার্হস্থ্য, নব্বই-এর দশকে তাঁর সান্নিধ্যকে মরুদ্যান করে পূর্বাপর তিন প্রজন্মের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি গড়ে তোলেন 'ভাষা' গোষ্ঠী।

'পোড়া রুটির মানচিত্র ও অন্যান্য কবিতা', 'অতলান্তের দু-দিক', 'দাগ', 'এই দলিলজীবন' নামে কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে কবি কৃত্তিবাস চক্রবর্তীর। প্রেমে ও প্রতিবাদে উচ্চকিত স্বরক্ষেপন করেন কৃত্তিবাস তাঁর কবিতায়। জীবন-ঘনিষ্ঠ কবি জীবনের মধ্যে অতিবাহিত করতে চান তাঁর প্রেম ও যাপন —

'মেঘের রঙে বানাও ছাতা, বাঁচাও মাথার রঙিন ও চুল
তুমি যেমন তেমনি সে-ও, মধ্যিখানে অনন্ত ভুল।
আমি বাবা বাউল হব, ওফ্! কী ভারী এই একতারা
তলানিতে ঠেকল বলে, জ্বলছে আমার সাবেক তারা।'

এবং

'তিনি আমায় বলে গেছেন বিশ্বাস কর্, বিশ্বাস কর্।
যাবার সময় আলতো কানে, বীজমন্ত্র — 'তারপরে মর্'
বাঁচতে বাঁচতে মরছি আমি মরতে মরতে আছি বেঁচে
এই জীবনে সলতে পাকাই আর জীবনে জ্বালব নেচে।'

তার রানি সিরিজের কবিতা বাংলা প্রেমের কবিতায় এক বিশেষ সংযোজন।

এই পরিমণ্ডলে আর যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন কাব্যসাধনা করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রদীপ সরকার, শুভেশ চৌধুরী, লক্ষ্মণ বণিক, অশোকানন্দ রায়বর্ধন, অলক দাশগুপ্ত, প্রত্যুষ দেব, সদানন্দ সিংহ। দীর্ঘকাল ধরে লেখালেখি করলেও তাঁদের কাব্যগ্রন্থ পরবর্তী শতকের শূন্য দশকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। অবশ্য বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতায় বিচরণের টানা ধারাবাহিকতা রয়েছে। এরাজ্যে বাংলা কবিতায় ছন্দনির্মাণে তিনি সমৃদ্ধ। তিনি প্রত্যয় করেন —

'আজ একটি কবিতা লিখব বলে
মেঘের গায়ে শব্দ ছড়িয়ে দিলাম
যে শব্দে তুমি ভিজবে আগামীকাল।'

মিস্টিক অর্থবাহী তাঁর কবিতা —

'জলে চাঁদ ভাসলে আমি ঢিল ছুঁড়ি না
আমার ভয় হয় যদি চাঁদমুখ ভেঙে যায়!'

চাঁদ'-এর আলঙ্কারিক প্রয়োগও লক্ষণীয়। সদানন্দ সিংহের কবিতা নস্টালজিক। প্রদীপ সরকার গদ্যে ও পদ্যে সমান সঞ্চারী। নির্যাতিত মানুষের প্রতি তাঁর এক গভীর মর্মবোধ তাঁকে কবিতায় প্রাণিত করে। এই পার্বতী মাটির জল, হাওয়া, মানুষকে স্মরণ করে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'যে মাটিতে জীবন জাগে' এক অন্যধারার সংযোজন। গভীর গোপন প্রদেশের ভাষা প্রকাশে সংযত অশোকানন্দ। শব্দনৈপুণ্যে রহস্যময় তাঁর কবিতার ভাষা।

নয়ের দশকের শুরুতেই এক বিশাল বাঁক নেয় কবিতা। এক ঝাঁক স্মার্ট, মনীষাদীপ্ত মেধাবী কবির আবির্ভাব ঘটে। এইসময়ে সমগ্র বাংলাকবিতায় উত্তরাধুনিক চেতনার যে নবনির্মাণ শুরু হয়েছে আগের দশক থেকে, তার প্রভাব এখানে সঞ্চারিত হয়। এই কবিরাও বাংলা কবিতার বিনির্মাণপ্রচেষ্টায় নিমগ্ন। বাংলাকবিতায়

দীর্ঘ অনুসৃত ধারাকে অতিক্রম করে গভীরতা অভিমুখী। বাস্তবের প্রতিফলন বা পরাবাস্তবের জীবনায়ন পর্যায় অতিক্রম করে তাঁদের কবিতায় সৃষ্টি হয় মায়াবাস্তবতা বা জাদুবাস্তবতার জলধিসঙ্গম।

এই রাজ্যে কবিতায় নিজেদের মেধামকরন্দ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মাধব বণিক, প্রবুদ্ধসুন্দর কর, অশোক দেব, স্বাতী ইন্দু, সুস্মিতা চৌধুরী, আকবর আহমেদ, নিধির রায়, জাফর সাদেক, বিমল চক্রবর্তী, পল্লব ভট্টাচার্য, অপন দাস, মণিকা বড়ুয়া, সুমিতা চক্রবর্তী, বিনয় সিন্‌হা, তমালশেখর দে, শঙ্খ সেনগুপ্ত, সমর চক্রবর্তী, সাত্ত্বিক নন্দী, গোবিন্দ ধর, মৃদুল বণিক, মণিকা চক্রবর্তী, মিলনকান্তি দত্ত, নীলিমেশ পাল, প্রণব দেবনাথ, অশীন বর্মন, অনন্ত সিংহ, দেবাশিস চক্রবর্তী, পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী, অপাংশু দেবনাথ প্রমুখ।

এই পর্যায়ে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 'প্রদত্ত বিন্দুসার' (১৯৯১) প্রকাশ করে আর থেমে থাকেননি মাধব বণিক। ধাবমান অশ্বধ্বনির ছন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন কবিতার পর কবিতা। 'বনজ ঘোড়ার পায়ের শব্দ' (২০০০), 'হে বালক, এখানে ঘুড়ি ওড়াবে না' (২০০৬), 'মেঘ এনেছি, ভিজবেন?' (২০০৬), 'ভীষণ বলতে ইচ্ছে হয়', 'জেগে থেকো, আসছি' (২০১০), 'পাখিদের ছু-মন্তর' (২০১১) ইত্যাদি কবিতার বই। তাঁর কবিতার ভাষায় আমাদের ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। মিথের পুনর্বয়ন ঘটে। তাঁর কাব্যরূপশব্দে —

'মেঘ সন্ন্যাসী হয়ে বসে রইল চুপি চুপি
খোয়াই ব্যারেজ পেরিয়ে টং-ঘরে
ব্যারেজবন্দী যুবতী জল বুক উঁচু করে ডাকল
"চলে এসো"। শ্রাবণের বিলম্ব বন্যায় কেন এত শুনশান
কবে আর পাবে আমায়? এইবেলা এসো মিশে যাই দুজনে।
মেঘ ফিরেও তাকাল না।
জল নেমে যেতে যেতে তখনও চেয়েছিল আকাশের দিকে।
মেঘ বিশ্বামিত্র হল না।' (তুলিকাগুচ্ছ-১০৯)

প্রবুদ্ধসুন্দর কর-এর প্রকাশিত চারটি কাব্যগ্রন্থে তাঁকে বাংলাকবিতায় অন্যভাবে চিহ্নিত করা যায়। কবিতায় মগ্নতা, এক শৈল্পীক ইন্দ্রিয়বোধ ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায়।

'রাতে দুধ খাওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়ে গেল
তামাকের পাউচ ফুরিয়ে এসেছে'

— দৈনন্দিন জীবনের স্মরণ-বিস্মরণ। তীব্র শ্লেষ তাঁর কবিতায় এক অন্যমাত্রার অনুসঙ্গ। সমকালের মধ্যবিত্ত বেহায়াপনাকে উলঙ্গ করে তাঁর কবিতা। তৎসম শব্দের সঙ্গে লৌকিক বা চলতি শব্দে শব্দবন্ধ তৈরি করা শঙ্খপল্লবীয় রীতি তাঁর কবিতায়ও রয়েছে।

'মমির কাছাকাছি', 'অবন্দিত অংশ' এবং 'বাইসাইকেলের বয়স' অশোক দেবের কাব্যগ্রন্থ, এসময়ের মেধাবী কবির কাব্যাদর্শের নিদর্শন। তাঁর কবিতায় বাস্তব থেকে পরাবাস্তবে না গিয়ে বাস্তবই মুখোমুখি হয় পরাবাস্তবের। কোথাও কোথাও শ্লেষাত্মক ও ইন্দ্রিয়বেদী হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। আকবর আহ্‌মেদ দেশজ শব্দপ্রয়োগে এই ভূখণ্ডের বাংলা কবিতাকে আলাদাভাবে চিহ্নায়নের সংকেত দিয়ে চলেছেন। পল্লবের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষ। কবিতা রচনার পাশাপাশি পল্লব ভট্টাচার্য ও অশোক দেব কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় ও গদ্যসাহিত্যে ইতিমধ্যে বেশ মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। স্বাতী ইন্দু ও সুস্মিতা চৌধুরী এই প্রজন্মের নারীসত্ত্বার প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন তাঁদের কবিতায়।

মিলনকান্তি দত্তের কবিতার বাকশৈলীতে সন্ধ্যাভাষার ছায়াপাতের

উত্তরাধিকার। সংকেতসংবেদী তাঁর কাব্যভাষা। তাঁর কাব্যগ্রন্থ — 'শরীর ভরে দিয়েছিলে অমোঘ তরবারি', 'করতলপৃষ্ঠে ফট্' ইত্যাদি। মিলনকান্তি দত্তের কবিতা এ ধরনের সুমিতবিন্দুর আবর্তন। গোবিন্দ ধর ও অপাংশু দেবনাথ এই দশকে লেখালেখিতে এলেও পরবর্তী দশক থেকে তাঁদের স্থায়ী উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

আগের দশকসমূহে কাব্যচর্চায় এসে এই দশকে এভাবে অনেকেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছেন। স্বাধীনোত্তর বাংলাকাব্যচর্চায় পশ্চিমবঙ্গীয় ধারাকে দীর্ঘদিন অন্যান্য অংশের কাব্যস্বভাব অনুসরণ করত। মোটামুটিভাবে নয়ের দশক থেকে বাংলা কবিতার চলতি ধারায় এ রাজ্যের কবিদের জেহাদি উপস্থিতি কাব্যভুবনকে সচকিত করে তুলেছে। সেইসঙ্গে সমৃদ্ধিও। এ রাজ্যের কবিতা এখন আন্তর্জাতিক পরিসরেও উচ্চারিত বয়ান। বাংলা কবিতার স্বার্থে, বাঙালি সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রতিস্রোতের বিপরীতে সৃজনস্পৃহায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে কবিদল, পুরুলিয়ায়, মেদিনীপুরে, বাঁকুড়া, শিলিগুড়ি, শিলং, গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া, শিলচর, হাইলাকান্দি, ধর্মনগর, কৈলাসহর, আগরতলা, বিশালগড়, উদয়পুর, বিলোনীয়া আর সাব্রুম-এ। বাংলা কবিতার বিশাল পরিমণ্ডলে শুরু হয় নির্মাণ উল্লাস। নিজস্ব একান্ত শৈলীতে।

এই নির্মাণ উৎসবে পঙ্‌ক্তিসম্মেলনের ফলেই শূন্য দশকে এসে অগ্রজ কবিদের অনেকেই ইন্ধন পেয়েছেন কাব্যসৃষ্টির। গ্রন্থ প্রকাশের। 'পৃথার জন্য প্রত্নকথন' (২০০০), 'রূপকথা নয় চুপচাপ' (২০০১), 'দ্রোহজমিন' (২০০৮) — কবি প্রত্যুষ দেব তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে সময়ের অস্থিরতার পরও দেখেন স্বচ্ছ ভোরের স্বপ্ন। সমস্ত বিচ্ছিন্ন অনভূতির প্রকাশের মধ্য দিয়ে কবি বিশ্বস্ততায় করেছেন মায়াবন্টন —

'পৃথা, আমাদের এই শহরে
তুমি এখন ট্রাফিক পুলিশ'
(আগরতলার ট্রাফিক বালিকাদের জন্য। পৃথার জন্য প্রত্নকথন)।

অন্যত্র দেখি রাজনৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষবাক্য —

'জোট বলো আর ভোট বলো, ছাই,
মহান ভারত কোথাও নাই
স্বার্থ এবং ছলচাতুরি
ফোঁপরদালাল আর জুয়াড়ি
ভারত ওদের মহান বটেই
তোবা তোবা থুড়ি থুড়ি' (তেতো কথা। রূপকথা নয় চুপকথা)

আবার এই কবিই ভালোবাসায় বিনম্র হন —

'ভালোবাসা কিছুই নয়
আমাদের পাথরজন্ম সমুদ্র সৈকতে শুয়ে থাকে
জলের প্রবজ্যায় (অববাহ/ দ্রোহজমিন)।

এরপর বেরিয়েছে 'আমাদের ঘুড়ির জীবন' (২০১৫)।

'অন্ধ জনক' (১৯৮৬), 'তখন পিকাসো' (১৯৯০), 'ভোরের সেঁউতি' (১৯৯৮)-এর পর কবি লক্ষ্মণ বণিক এ শতাব্দীর শূন্য দশকে এসে পরপর প্রকাশ করেছেন 'দিনরাত্রির সংলাপ' (২০০০), 'প্রতিপক্ষের আমন্ত্রণলিপি' (২০০২) এবং 'ধানকল' (২০০৯)। এই দশকের আগের কাব্যগ্রন্থগুলো তাঁকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করেছে। এই দশকের কাব্যগ্রন্থগুলোতে কবি তাঁর কাব্যভাষায় এক নতুন আদল আনতে পেরেছেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থটি (ধানকল) এক বিশেষ গদ্যশৈলীতে রচনা। সোনার তরীতে যে ধান কৃষক তুলে দিয়েছেন অচেনা নেয়েকে, নিজেকে নিঃস্ব করে, আর এখানে কবি সেই সোনার ধানকে ছড়িয়ে

দিলেন ঢালা গদ্যে। তার নির্যাস যেন পৌঁছোয় পাঠকের হৃদয় অবধি —

'ধান থেকে চাল উৎপাদন, এতে বৃষ্টির কোনও ভূমিকা নেই,
ছায়ারও; বরং ওসবের পাল্লায় একবার পড়ে গেলে ওরা মারাত্মক
ভোগায়; ভারী হয়ে ওঠে সংসারের অসুবিধার পাল্লা।'

কিংবা 'শ্রমিককে শ্রমিক বলে মেনে নিতে বাধে মালিকের।'

এখানেই সোনার তরীর সঙ্গে মিল। সংগ্রাহক দুজনেই বঞ্চিত করে শ্রমজীবীকে। এ এক বহুস্বীকৃত দ্বান্দ্বিক দর্শন। ২০১৫ সালে প্রকাশিত তাঁর কবিতার বই 'বৈশ্যবালক'।

গদ্যে হাত দিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করলেও অলক দাশগুপ্ত তাঁর 'অরণ্য ক্যাম্পাস' (২০০৮) কাব্যগ্রন্থে বলেন,

'সাতনরী হার দেব, গলায় পরিয়ে দেব
পেড়ে দেব ফাল্গুনী চাঁদ, একথালা ধোঁয়া ওঠা ভাত
চোখেতে স্বপন দেব, দেব তোরে এনে দেব
একফালি রঙিন আকাশ'।

স্বপ্নময়তার মধ্যে এক অফুরান জীবনের কথা বলেন এই কবি।

কবিতার মুখচন্দ্রিকা করে যাওয়ার ফলে শূন্য দশক আর শূন্য থাকেনি উত্তর প্রজন্মের কাছে। এ দশকেও বেশ কয়েকজন শক্তিমান কবি এসে গেছেন বাংলা কবিতার রিভলভিং ডায়াসে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সমর চক্রবর্তী, পদ্মশ্রী মজুমদার, সুতপা রায়, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপ মজুমদার, শুভ্রশংকর দাশ, বিনয় সিন্‌হা, বাসুদেব মালাকার, অভিজিৎ চক্রবর্তী, পঙ্কজ বণিক, রুমা সাহা, সলিলা নাথ, বিমল শীল, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুজিত দেব, গোপেশ চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বেগম, আলপনা নাথ, রেহানা বেগম বাবলি, বিধাতৃ দাম, খোকন সাহা, শ্বেতা চক্রবর্তী, প্রীতি আচার্য, সুমিতা ধর বসুঠাকুর প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে প্রদীপ মজুমদার মিতকথনে কাব্যনির্মাণ করেন। তাঁর

'মেঘে আর চাঁদে, সারারাত খুব যুদ্ধ হল
ছিল অরূপ ব্যঞ্জনা ভরা কাম
ঢেউ ছিল ঘুমন্ত নদীর বুকে।
অনন্তর পাখিদের ঠাট্টা আর
হাওয়া-পাগল শৃঙ্গার-ধ্বনির ভেতর
আরো কিছু নিদ্রাহীন রাত।' (নিদ্রাহীন/ জাহাজডুবির আগে)

প্রত্নভাষায় সৃষ্ট কাব্য। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেও (হাওয়াপত্র ২০১১) এই মিতভাষী বয়ান উপস্থিত —

'তোমার ভাঁড়ারে সত্যি কিছু আছে
অকৃপণ দিতে পারো। যা ফুরোবে না (বর্ষা)।

বৃষ্টিচিহ্ন (২০১৫)-র পর এই কবির সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'জ্যোৎস্না কার্নিভাল'। এই সংক্ষিপ্ত বাচনিক ধারার কবি বিনয় সিন্‌হা (জলপথ), পদ্মশ্রী মজুমদার (আত্মস্তব) এবং কিছুটা বাসুদেব মালাকারও (চন্দ্রাঘাত ও গোপন ঈশ্বরী)। কাকলি গঙ্গোপাধ্যায় নিজস্ব শৈলীতে আত্মপ্রকাশের পাশাপাশি হাত পাকিয়ে নিয়েছেন কাব্যের অনুবাদ কর্মেও (পাগল, বালি ও ফেনা — খলিল জিব্রান)। ২০১৪ সালে বেরিয়েছে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'শ্রাবণলিপি'। অঙ্কুরেই হারিয়েই গেল শ্বেতা ভট্টাচার্যের মতো কবি। আশা জাগাচ্ছে পঙ্কজ, শুভ্রশংকর।

এই শতাব্দীর একের দশকে যে তরুণ প্রজন্ম কাব্যচর্চার জন্যে এসেছেন এই ভূখণ্ডে, তাঁরা প্রত্যেকেই মেধাবী। জ্ঞান-বিদ্যায়ও তাঁরা পূর্বজ অনেকের থেকে এগিয়ে। তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পর্যায়ের যেমন রয়েছেন, তেমনি

রয়েছেন বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষায়ও উচ্চশিক্ষিত। আবার উচ্চশিক্ষিত অথচ জীবনযুদ্ধে প্রতিক্ষণের সৈনিক যেমন রয়েছেন তেমনি অনিশ্চিত জীবন গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তরুণ-তরুণীও রয়েছেন। ফলে তাঁদের প্রতিক্ষণের ক্ষরণ কবিতায় উঠে আসছে। এই প্রজন্মের কাছে গোটা বিশ্বই এখন তালুবন্দি সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির ঔৎকর্ষের সৌজন্যে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমগুলোর সঙ্গে তাঁদের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। মুদ্রণমাধ্যম ছাড়াও বিভিন্ন সোশ্যালমিডিয়া ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁদের কবিতা মুহূর্তে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। পক্ষান্তরে তাঁরাও পরিচিত হতে পারছেন সাম্প্রতিক কবিতার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে। ফলে তাঁদের কবিতা স্থানিক বন্ধন ছাড়িয়ে দূরচারী হতে পেরেছে। এঁদের কবিতায়ও সেই লক্ষণ প্রকট। এখনই সবার সম্বন্ধে কিছু বলা না গেলেও সম্ভাবনাময় যে সব কবিরা এই সময়ে বাংলা কবিতার ভুবনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন — রতন আচার্য, রাংকুমার দাস, সঞ্জীব দে, অভীককুমার দে, বিপুলকান্তি চক্রবর্তী, অমরকান্তি সূত্রধর, মৃণালকান্তি নাথ, অপর্ণা নাথ, রাজীব ভট্টাচার্য, চিরশ্রী দেবনাথ, হারাধন বৈরাগী, রিয়া দেবী, রীতা শিব, বিদ্যুৎ হোসেন, ধ্রুব চক্রবর্তী, সুমন পাটারি, বাপ্পা চক্রবর্তী, বাপী ভট্টাচার্য, স্মিতা দেবসরকার, রাজীব মজুমদার, অরিজিৎ দেব, সৈকত মজুমদার, শান্তনু চক্রবর্তী প্রমুখ।

নতুন শতাব্দীর দুটো দশক অতিক্রান্তপ্রায় ত্রিপুরার বাংলাকবিতা। এককালে স্বীকৃত যে ভূখণ্ডের কবিতা-লখাই, তাকে যেন কলার মান্দাসে করে বেহুলা-কবি বহু বাঁক আর জল-ঘূর্ণি আর পাকদণ্ডী পেরিয়ে পাঠকের দেবসভায় উপস্থিত করেছে। আগামী সময় বলবে, আজ যারা কবিতার কাণ্ডারী এই ভূখণ্ডে, তারা কবিতাকে কোনদিকে বয়ে নিয়ে যাবেন। এতদূর যখন পেরিয়ে আসা গেছে, তবে সামনে এগোনোও যাবে। নিশ্চিতই।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. রাজমালা ত্রিপুরার ইতিহাস — কৈলাস চন্দ্র সিংহ
২. দেশীয় রাজ্য — কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মন
৩. শতাব্দীর ত্রিপুরা — রমাপ্রসাদ দত্ত ও নির্মল দাশ (সম্পাদিত)
৪. ত্রিপুরার কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি প্রসঙ্গে — রমাপ্রসাদ দত্ত
৫. ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা — রমাপ্রসাদ দত্ত
৬. ত্রিপুরার রাজ অন্দরে সাহিত্য চর্চা — মুকুলকুমার ঘোষ
৭. রাজসী ত্রিপুরায় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ — দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী
৮. রাজসভার কবি ও কাব্য — দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯. ত্রিপুরার ইতিহাস — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
১০. ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১. রাজন্য ত্রিপুরার বাংলা ভাষা — পান্নালাল রায়
১২. ত্রিপুরা রাজমালা — পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী
১৩. ত্রিপুরার রাজ আমলের বাংলা সাহিত্য — ড. রঞ্জিতচন্দ্র ভট্টাচার্য
১৪. ত্রিপুরার সাহিত্য অতীত থেকে সাম্প্রতিক — ড. মৃণালকান্তি দেবনাথ (সম্পাদিত)
১৫. ত্রিপুরার বাংলা কবিতা : পরিব্রাজনে দূরাগত পদচিহ্ন — অশোকানন্দ রায়বর্ধন (প্রবন্ধ - আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব-২০১২ স্মরণিকা)
১৬. ত্রিপুরার বাংলা কাব্যের হাজার বছর — অশোকানন্দ রায়বর্ধন (প্রবন্ধ - বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব - ১৪১২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ, স্মারকগ্রন্থ)